২০০৩

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ☐ ১৯ তম সংখ্যা

১৫ এপ্রিল, ২০০৩ ঈসাব্দ

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

জলসায় বক্তব্য রাখছেন মাওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন অধিবেশনের সভাপতি, মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২, এ কে রেজাউল করীম, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওমরে আমা, মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ, ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী, মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান, প্রেসিডেন্ট কটিয়াদী জামাত এবং সৈয়দ আনোয়ার আলী, প্রেসিডেন্ট তেরগাতী জামাত।

তেরগাতী জামাতের সালানা জলসায় উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের একাংশ

প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মরহুম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেবের কবর যিয়ারত করছেন বর্তমান ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমান সাহেব এবং আহমদনগর জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ

এমটিএ-একটি ঐশী নিয়ামত

এমটিএ-মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল আল্লাহ্‌তাআলার অসংখ্য নিয়ামতের মাঝে একটি। প্রচার মাধ্যমে একটি অনন্য ঐশী সংযোজন। ১৯৯২-৯৩ ঈসাব্দে এর শুভ যাত্রা শুরু হয়। আজ পর্যন্ত এটা সারা বিশ্বের পাঁচটি মহাদেশে অহোরাত্র আল্লাহ্, রসূল (সঃ)-এবং যুগ-ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর পবিত্র বাণী প্রচার করে আসছে। এটি একমাত্র প্রচার মাধ্যম যা কেবল আহমদীয়ত তথা সত্যিকারের ইসলামের বাণী পৃথিবীর বেশ কয়েকটি ভাষায় প্রচার করে চলেছে। এটাই একমাত্র প্রচার মাধ্যমে যার মাধ্যমে অন্যান্য কতিপয় ভাষা ছাড়াও আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় ৪ বার বিশ্ব সংবাদ প্রচারিত হয়ে থাকে। বাংলা ভাষার মর্যাদার কথা অনেকেই বলেন; কিন্তু বাংলা ভাষায় সারা বিশ্বে একই সময় বিশ্ব সংবাদ প্রচার করে এমন প্রচার মাধ্যম দ্বিতীয়টি নেই। এছাড়াও এর মাধ্যমে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফার জুমুআর খুতবা প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় নিয়মিত সরাসরি লন্ডন মসজিদ থেকে প্রচারিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া বাংলাভাষা সহ বিভিন্ন ভাষায় যুগ-খলীফার সাথে মুলাকাৎ (সাক্ষাৎকার) অনুষ্ঠান, প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান, চিলড্রেনস্ কর্ণার, উর্দূ ক্লাস প্রভৃতি রীতিমত প্রচারিত হয়ে থাকে। কুরআন তেলাওয়াত সহ বিভিন্ন ভাষায় তরজমা ও বিভিন্ন ভাষায় নজম (কবিতা) প্রচারিত হয়ে একে আনন্দঘন করে তোলে। ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতার বাহন এ প্রচার মাধ্যমটি সব সময় অপসংস্কৃতি, বেলেল্লাপনা এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের উপকরণাদি বিবর্জিত অনুষ্ঠানাদি প্রচার করে বিশ্বে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছে ইতোমধ্যে। নির্মল ও স্বচ্ছ অনুষ্ঠান প্রচার করা এর বৈশিষ্ট্য ।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) হলেন এ প্রচার মাধ্যমের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। একমাত্র তাঁর অসম সাহসিকতা ও দোয়ায় গড়ে উঠেছে বিশ্বব্যাপী এ প্রচার মাধ্যমটি। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য দীর্ঘ কর্মময় জীবনের জন্যে দোয়া করি। তিনি (আইঃ) এ জন্যে ইতিহাসের পাতায় যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যুগ-খলীফার নেতৃত্বে আহমদী জামাতের মত একটি দরিদ্র জামাত প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এ প্রচার মাধ্যমটি প্রবাহমান রেখেছে। কিন্তু এটাই কি আমাদের জন্যে গৌরবের কারণ হবে? এতেই কি আমাদের কল্যাণের কারণ হবে?

আমাদের প্রিয় খলীফার ঐকান্তিক ইচ্ছা আহমদীরা যেন তাদের ঘরে এমটি-এর সংযোগ স্থাপন করেন এবং এর অনুষ্ঠানগুলো নিজেরা দেখেন ও অন্যদেরকে দেখান। এমটিএ-র দর্শক-শ্রোতা যত বাড়বে জামাতের প্রচার প্রক্রিয়া তত সফল ও কার্যকরী হবে। হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা ও মুলাকাৎ অনুষ্ঠানগুলোতে আধ্যাত্মিক জীবন সঞ্জীবনী সুধা থাকে। সুতরাং এমটিএ-র দর্শক শ্রোতা যাতে বাড়ানো যায় এবং জামাতের সদস্যরা যাতে এমটিএ-কে বেশি বেশি দেখেন সেজন্যে প্রত্যেক জামাতের কর্মকর্তাদের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি। বিগত জলসার সময় হুযূর (আইঃ)-এর প্রতিনিধি মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেবও এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ জোর দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে এমটিএ দেখার ও দেখাবার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

মোবাশ্‌শেরউর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬৫ বর্ষ ॥ ১৯তম সংখ্যা

২ বৈশাখ ১৪১০ বঙ্গাব্দ ১১ সফর ১৪২৪ হিঃ কাঃ
১৫ শাহাদত ১৩৮২ হিঃ শাঃ ১৫ এপ্রিল ২০০৩ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে L 50/ $ 100

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

যুগ-নূহের কিশতিতে আরোহণ করুন!

আল্লাহ্‌তাআলার একজন বিশিষ্ট শরীয়তবাহী নবী হলেন হযরত নূহ আলায়হেস্ সালাম। আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তিনি প্রাচীন মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথে নিয়ে আসার জন্যে বহু চেষ্টা-প্রচেষ্টা করলেন; কিন্তু তারা সকলে তাঁর কথায় সাড়া দিল না। অধিকাংশ লোক তাঁর বিরোধিতা করলো। তাঁকে লাঞ্ছিত ও অবমানিত করলো। পরে তিনি আল্লাহ্‌তাআলার নিকট অনেক অনুনয় বিনয় করে দোয়া করলেন। তাতেও তাদের মন ফিরলো না। আল্লাহ্‌তাআলার তকদীর তাদেরকে শাস্তি দিতে মনস্থ করলেন। আল্লাহ্‌তাআলা হযরত নূহের অনুসারীদের রক্ষাকল্পে হযরত নূহ (আঃ)-কে একখানা নৌকো তৈরী করতে বল্লেন। নির্ধারিত সময়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সেখানে প্লাবন দেখা দিলো। হযরত নূহ (আঃ)-এর অনুসারীরা নৌকোয় চড়ে রক্ষা পেলেন এবং অন্যেরা ডুবে মারা গেল; এমন কি হযরত নূহের ছেলে তাঁকে না মানার কারণে ডুবে মারা গেল।

বর্তমান যুগে মানবতা যখন চরম অবক্ষয়ের প্লাবনে হাবু-ডুবু খাচ্ছিলো তখন আল্লাহ্‌তাআলা এ যুগের নূহ যুগ-ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আর্তমানবতাকে রক্ষার জন্যে একখানা কিশ্‌তি বা নৌকো তৈরী করতে বল্লেন। এ কিশ্‌তি কোন লোহা কাঠ বা ধাতব পদার্থে তৈরী নয়- এ কিশ্‌তি হলো তাঁর কুরআন ও সুন্নাহ্‌ভিত্তিক শিক্ষা যা তিনি তাঁর বিখ্যাত কিশ্‌তিয়ে নূহ পুস্তকে সন্নিবেশ করছেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এ শিক্ষানুযায়ী যারা তাদের জীবন নির্বাহ করবেন তারা তাঁর আধ্যাত্মিক গৃহের অধিবাসী বিধায় তাদেরকে রক্ষা করা হবে। যেমন, ইলহাম মারফত আল্লাহ্ তাঁকে অবহিত করেছেন- 'ইন্নী উহাফিযু কুল্লা মান্ ফিদ্দার' অর্থাৎ নিশ্চয় তোমার গৃহের চার দেয়ালের মাঝে যারা রয়েছে তাদেরকে রক্ষা করা হবে। আল্লাহ্‌তাআলার এ প্রতিশ্রুতি মোতাবেক পাঞ্জাবের বিভীষিকাপূর্ণ প্লেগের দিনে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর অনুসারী আহমদীগণ রক্ষা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ইতিহাস এর জ্বলন্ত সাক্ষী।

আল্লাহ্‌তাআলা কখনও তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। আজকের দুনিয়া যেভাবে অবক্ষয়ের প্লাবনে হাবু-ডুবু খাচ্ছে, আজকেও বিশ্ব যদি রক্ষা পেতে চায় তাহলে বিশ্ববাসীকে যুগ-নূহের কিশ্‌তিতে আরোহণ করতে হবে। নূহ (আঃ)-এর পুত্র যেমন তাঁর পুত্র হওয়ার সুবাদেও রক্ষা পায় নি। তেমনি শুধুমাত্র 'আহমদী' নাম ধারণ করার কারণে আমরাও রক্ষা পাবো না। যুগ-নূহের শিক্ষার আলোকে আমাদের পরিপূর্ণভাবে আলোকিত হতে হবে নচেৎ আমাদের জন্যেও যথেষ্ট ভয়ের কারণ আছে। আমাদের প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) ৮ই আগষ্ট '৯৭ তারিখের খুতবায় বলেছিলেন- আপনারা যদি এ নৌকায় আরোহণ করেন তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তি আপনাদের অণু পরিমাণও ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। তারা আপনাদের সামনে দেখতে দেখতে একের পর ডুবতে থাকবে। এটা সেই তকদীর (অবধারিত বিষয়) যাকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা দুনিয়ার কারো নেই; এটা সেই তকদীর যাকে লক্ষ্য রেখে আমি মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলাম; এর ফলে এ বছর আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে জামাত অনেক অনেক গৌরবোজ্জল সফলতা অর্জন করেছে"।

সুতরাং আসুন আমরা সকলে যুগ-নূহের নৌকায় আরোহণ করি এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ করি। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) জামাতের লোকদেরকে বেশি বেশি কিশ্‌তিয়ে নূহ পুস্তক পাঠের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তদনুযায়ী আমল করতেও বলেছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ বলতে হচ্ছে, বর্তমানে ইরাক তথা গোটা মুসলিম বিশ্ব দাজ্জালী শক্তির আগ্রাসনের লোলুপ থাবায় নিষ্পেষিত হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের এ দুর্দিনে আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয় - আমরা দোয়া করি; কিন্তু কাজ হচ্ছে না। হাদীস ও কুরআনের শিক্ষার আলোকে এটাই জানা যায় যে, হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে দজ্জালী ও ইয়া'জুজ মা'জুজের ফিতনা নির্মূল হবে। সুতরাং যত শীঘ্র মুসলিম বিশ্ব এদের পরম সুহৃদকে চিনবে ও তাঁর নৌকায় চড়বে তত শীঘ্রই মুসলিম বিশ্বে মঙ্গল ও কল্যাণ হবে। এছাড়া তাদের সুরক্ষার আর কোন পথ নেই সেকথা জোর দিয়ে বলা চলে।

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা, শুভানুধ্যায়ী ও বিজ্ঞাপন দাতাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

- নির্বাহী সম্পাদক

ঐশী কথার মাঝে এক বিরাট প্রজ্ঞা এই যে, সেসব লোক যাদের বীজ নষ্ট হয়ে যায় তাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাসমূহকেও চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। নচেৎ একনিষ্ঠ মু'মিন ও একনিষ্ঠ মুত্তাকীগণের বীজ নষ্ট হয়ে যায় না। বলা হয়েছে কিছু বীজ অবশ্যই কঙ্করময় স্থানেও পতিত হয় কিন্তু মু'মিন কঙ্করময় স্থানে বীজ বপন করে না। কেননা, মু'মিন কেবল দেখানোর জন্যে বা নিজ মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে কাজ করে না। তারা এ কথা বলে বেড়ায় না যে, হ্যাঁ, আমি এত সময় তবলীগ করেছি, এত লোকের নিকট বাণী পৌঁছে দিয়েছি। এসব কথা দ্বারা রিপোর্ট পরিপূর্ণ থাকে আর তাতে ফল কী দাঁড়ায়? তারপরে এমন হলো যে, লোকেরা চলে গেলো, তার পরে এতদ্দ্বারা কোন লাভই হোল না। এরপরে এ দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কুরআন মজীদ তো মসীহ্ সম্বন্ধীয় দৃষ্টান্তের বর্ণনা দিয়েছে; কিন্তু দেখুন এটা কীরূপ মাহাত্ম্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। এক ডাক্তার যে রুগীর মানসিক অবস্থা বুঝে, তার মত রোগ নির্ণয় করে দিয়েছে। আল্লাহ্তাআলা বলে দিয়েছেন- "যদি তোমরা বীজ বপন করো আর প্রত্যেক বার তোমাদের বীজ নষ্ট হয়ে যায় এবং যখন বৃষ্টিপাত হয় তখন নিকটে আসার পরিবর্তে তা দূরে সরে যায়"-এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমবিকাশ লাভ করে তোমাদের ক্ষেতের রূপ ধারণ করার বদলে তা তোমাদের হাত থেকে সরে যেতে থাকে, তখন ধরে নাও যে, তোমাদের মাঝে কোন ত্রুটি ছিলো আর প্রকৃতই মসীহ্ (আঃ) যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাতো প্রতি দিনেই ঘটনার একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। রৌদ্র উঠলো আর বীজ নষ্ট হয়ে গেলো। বর্ষার সাথে বীজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্পর্ক- এটা একটি অতি অসাধারণ বিষয়বস্তু- এবং নতুন মাহাত্ম্যের বিষয়-বস্তু। একে কুরআন করীম বর্ণনা করেছে। প্রকৃত কথা এই যে, যখন ঐশী জ্যোতির্বিকাশ তেজদীপ্ত হয় যখন খোদাতাআলার দীপ্তি অধিক পরিমাণে অবতীর্ণ হয় এবং জামাতের উন্নতি সাধিত হয় তখন যাদের মাঝে দুর্বল সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে এরূপ লোকেরা সাথে সাথে চলতে পারে না তারা সেসব চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এমতাবস্থায় তাদের নিকট যা আশা করা হয়েছিল তারা তা পুরো করতে পারে না। তখন তাদের মৃত্যু অধিকতর ঐশী দীপ্তি প্রকাশের নিদর্শন হয়। কিন্তু কঙ্করময় মাঠে বীজ বপন করা এবং প্রতিদিন রৌদ্রের তেজে একে পুড়িয়ে দেয়া- এটা নিত্য দিনের এমন একটি বিষয় মানবীয় গুণাবলীর সাথে যার কোন গভীর সম্পর্ক নেই। কিন্তু কুরআন করীম যে বিষয়-বস্তু বর্ণনা করেছে ঈমান ও আমলের সাথে এর প্রতিদিন যে ঘটনাসমূহ প্রকাশিত হয় তার সাথে এক অতি গভীর এবং প্রকৃত সম্পর্ক রয়েছে। অতএব যে লোক বলে যে, আমরা তবলীগ করেছি ও বীজ ছড়িয়ে দিয়েছি এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন হয়েছে যে, সে জমিটি কঙ্করময়-অনুর্বর, কুরআন করীমের দৃষ্টান্ত তাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। আর বুঝা উচিত যে, কঙ্করময়-অনুর্বর ভূমিতে তোমরা কেন বীজ বুনেছিলে এবং এটা বলা ঠিক নয় যে, সারাটা ভূমিই কঙ্করময়-অনুর্বর বরং কুরআন করীম তো বলে যে, কঙ্করময়-অনুর্বর ভুমি হওয়া সত্ত্বেও এতে সম্ভবনা মজুদ রয়েছে যে, পাথর-কঠিন অন্তর ফেটে প্রস্রবণ ফুটে বের হতে পারে। অতএব যদি তোমরা দোয়ার সাথে এবং আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে কাজ করো তাহলে তোমাদের দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি হবে সেগুলো পুণ্য ফল দিবে। অতএব তবলীগের অতি গভীর বিষয়াদি বুঝান হয়েছে আর নিজের আত্ম-বিশ্লেষণের এক পদ্ধতি আমাদেরকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্তাআলা আহমদী জামাতকে এ থেকেও উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

আল্লাহ্তাআলা পক্ষে থেকে সে বীজে বরকত দানের প্রতিশ্রুতি ঃ

পুনরায় বিকশিত হয়েছে এমন বীজের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মসীহ্ (আঃ) আর আল্লাহ্তাআলা তা বরকতমন্ডিত করার যে প্রতিশ্রুতি মসীহ্ (আঃ)-এর সাথে করেছিলেন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করে এর মোকাবেলায় কিছু কিছু প্রতিশ্রুতি হযরত আকদস মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথেও করা হয়েছে এবং এদের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেও উল্লেখ করা হয়েছে। এখন দেখুন এ দুটোর মাঝে কত পার্থক্য!

মসীহ্ (আঃ) বলেন -

"কিছু উত্তম জমিতে পড়লো এবং ফল দিলো- কিছু একশ' গুণ, কিছু ষাট গুণ, কিছু ত্রিশ গুণ, যার কান আছে সে শুনে নিক"।

এক্ষেত্রে কুরআন করীম বলে -

মাসালুল্লাযীনা ইউনফিকূনা আমওয়ালাহুম ফী সাবিলিল্লাহি কামাসালি হাব্বাতিন আমবাতাত সাব'আ সানাবিলা ফী কুল্লি সুমবুলাতিম্মিয়াতু হাব্বাতিন ওয়াল্লাহু ইউযায়িফু লিমাইয়্যাশা'উ ওয়াল্লাহু ওয়াসি'উন আলীম (অর্থ - যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত এক শস্য বীজের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে ও প্রত্যেকটি শীষে একশ' শস্য বীজ থাকে। আর আল্লাহ্ যার জন্যে চান এর চেয়েও বৃদ্ধি করে দেন; প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী! [সূরা বাকারা ঃ ২৬২]

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ মুস্তাফার দাসগণ! তোমাদের জন্যে সুসংবাদ! তোমাদের দৃষ্টান্ত মসীহের বীজ বপনের দৃষ্টান্তের ন্যায় নয় যা অধিক থেকে অধিক শ'গুণ ফল দান করে। এথেকে নীচে নেমে ষাট গুণ অথবা এথেকেও কম। কুরআন বলেছে- মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সঃ)-এর দাস হও আর মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর কল্যাণে তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, ... **হাব্বাতিন আমবাতাত সাব'আ সানাবিলা**- সম্বলিত দৃষ্টান্ত এরূপ বীজের মত হবে যাথেকে সাতটি শীষ বের হয়েছে। সুনবাল বলতে শীষ বুঝায়। **ফী কুল্লি সুমবুলাতিম্মিয়াতু হাব্বাতিন**- আর প্রত্যেকটি শীষে একশ' দানা জন্মে। বলা হয়েছে যে, অধিক থেকে অধিক একশ' 'বরং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদের সাথে আমাদের প্রতিশ্রুতি আছে যে, যদি তোমরা এরূপ স্থানে বীজ বপন করো যা উর্বর হয় আর খোদা-ভীতির সাথে বপন করো তাহলে স্বয়ং তোমাদের দৃষ্টান্ত বীজের ন্যায় হয়ে যাবে যা ক্রমবিকাশ লাভ করে এরূপ ক্রমবিকাশ লাভ করবে যে, এর মধ্যে এক একটি শস্যদানায় সাত সাতটি শীষ বের হয় আর প্রতিটি শীষে একশ' করে শস্য দানা জন্মে অর্থাৎ সাতশ' গুণ অধিক ফলন হয়; কিন্তু এটাও তো একটি সীমাবদ্ধ প্রতিশ্রুতি এবং আঁ হযরত (সঃ) তো উন্নতির সকল সীমাকে ডিঙ্গিয়ে দিয়েছেন। অতএব খোদাতাআলা বলেন যে- **ওয়াল্লাহু ইউযায়িফু লিমাইয়্যাশা'উ**- এটা বুঝা উচিত নয় যে, সাতশ' গুণ পর্যন্তই কথা শেষ হয়ে যাবে।' যদি তোমরা তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করো তাহলো এ সেই রসূল (সঃ) যিনি তোমাদেরকে

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কুরআন মাজীদ ঃ সূরা আল্ আরাফ - ৭	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
হাদীস শরীফ ঃ পরনিন্দা	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৩
অমৃত বাণী ঃ চশমায়ে মসীহী হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ মৌঃ মুহাম্মদ আজিম উদ্দীন আহমদ	৪
জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্র 'নূর' সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫
জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্র 'নূর' সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৬
ঐশী বাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন	৬-৭
মুলাকাত ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ সংকলন ও অনুবাদ - আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	৮-৯
ছোটদের পাতা ঃ এস হাদীস শিখি	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	৯-১০
জুমুআর খুতবা ঃ ১১ এর পর ইনশাআল্লাহ্ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ ঃ জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১১-১৮
ইসলাম ও পারিবারিক জীবন	ঃ মাওলানা মাহমুদ আহমদ	১৯-২৩
মুনাজাতে রসূল (সঃ) - মূল ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৪
বাংলা সন মূলত হিজরী সন	ঃ আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২৫
কবিতা ঃ সালাম জানাই দু'জনারে	ঃ আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২৫
অনুশীলন	ঃ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	২৬-২৭
নতুনদের পাতা ঃ		
● পর্দা প্রগতির দিশারী	ঃ জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৮
● ইসলামী সমাজে নারীর অবস্থান	ঃ মৌঃ মোহাম্মদ আমির হোসেন	২৯
● ইসলামী ভ্রাতৃত্ব	ঃ মৌঃ মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম	৩০-৩৩
সংবাদ	ঃ	৩৩-৩৬

প্রচ্ছদ ঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগরে ২১তম সালানা জলসার দৃশ্য

বেহেশ্তি মকবেরায় সমাহিত বুযুর্গদের জন্যে দোয়া

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) লেখেন ঃ

"আমি দোয়া করছি খোদাতাআলা এতে কল্যাণবর্ষিত করুন। আর একেই বেহেশ্তি মকবেরা বানিয়ে দিন এবং এ জামাতের সেসব পবিত্র আত্মার লোকদের নিদ্রার স্থান যেন এখানে হয়, যারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের ওপরে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং পৃথিবীর মোহকে পরিত্যাগ করেছেন আর খোদার হয়ে গেছেন এবং নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে নিয়েছেন। আর রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাহাবাদের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও সততার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। তাই যেন হয়, হে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক (আল্ ওসীয়্যত পুস্তক পৃষ্ঠা ১৫, রূহানী খাযায়েন, ২০ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১৬)।

"পুনরায় আমি দোয়া করছি হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! এ ভূমিকে আমার জামাতের পবিত্র লোকদের কবর বানাও যারা আসলেই তোমার হয়ে গেছে আর পৃথিবীর উদ্দেশ্যের মিশ্রণ তাদের কাজ-কর্মের মাঝে নেই, তা-ই যেন হয় হে বিশ্ব-জগতের প্রভু-প্রতিপালক"।

"আবার আমি তৃতীয়বার দোয়া করছি, হে আমার সর্বশক্তিমান দয়ালু, হে পরম ক্ষমাশীল বার বার কৃপাকারী খোদা! তুমি কেবল সেসব লোকদেরকেই এস্থানে কবরের জায়গা দাও যারা তোমার এ দূতের ওপরে সত্যিকারের ঈমান রাখে আর নিজের মধ্যে কোন কপটতা ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ও কুধারণা পোষণ করে না। এবং যেভাবে ঈমান ও আনুগত্যের আবশ্যক তা সম্পাদন করে। আর তোমার জন্যেও তোমার পথে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে দিয়েছে। যাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও যাদেরকে তুমি জানো এবং সর্বৈব তোমার ভালবাসায় বিলীন হয়ে গেছে ও তোমার প্রেরিত লোকের ওপরে বিশ্বস্ত ও পূর্ণ সম্মান এবং স্বস্তি ও ঈমানের সাথে ভালবাসা এবং প্রাণোৎসর্গের সম্পর্ক রাখে, তাই যেন হয়, হে বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক! (আল্ ওসীয়্যত পুস্তক, পৃষ্ঠা ১৭-১৭)

কালামুল ইমাম

নিজের জামাতের জন্যে দোয়া

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজের পুস্তক 'কিশতিয়ে নূহ'তে 'আমাদের শিক্ষা' বর্ণনা করে এ দোয়া দ্বারা শেষ করেছেন ঃ

"এখন আমি দোয়া করছি, আমার এ শিক্ষা তোমাদের জন্যে কল্যাণজনক হোক এবং তোমাদের মাঝে এমন পরিবর্তন সৃষ্টি হোক যেন তোমরা পৃথিবীর তারকায় পরিণত হয়ে যাও আর পৃথিবী এ আলোকে আলোকিত হয় যা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের লাভ হয়" (কিশতিয়ে নূহ, পৃষ্ঠা ৭৬, রূহানী খাযায়েন, ১৯ খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৫)।

উপস্থাপন ও অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

সূরা আল্ আ'রাফ - ৭

فَلَمَّآ اٰتٰىهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتٰىهُمَا ۚ فَتَعٰلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۱۹۱﴾

১৯১। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে সুস্থ-সবল (সন্তান) দান করেন, তখন তারা সে (সন্তান) সম্বন্ধে যা তিনি তাদেরকে দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে শরীক করে। অথচ যা তারা শরীক করে আল্লাহ্ তা থেকে উর্ধ্বে।

اَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ﴿۱۹۲﴾

১৯২। তারা কি তাদেরকে (তাঁর সঙ্গে) শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়?

وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ﴿۱۹۳﴾

১৯৩। এবং তারা তাদেরকে কোনও সাহায্য করতে সক্ষম নয়। আর তারা নিজেদেরকেও কোন সাহায্য করতে সক্ষম নয়।

وَاِنْ تَدْعُوْهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَتَّبِعُوْكُمْ ۭ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعَوْتُمُوْهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُوْنَ ﴿۱۹۴﴾

১৯৪। এবং যদি তুমি তাদেরকে হেদায়াতের দিকে ডাক, তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদেরকে ডাক বা নীরব থাক, তোমাদের জন্য সমান।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۱۹۵﴾

১৯৫। আল্লাহ্কে ছেড়ে তোমরা যাদেরকে ডাক, নিশ্চয় তারাও তোমাদের মত বান্দা। সুতরাং তোমরা সত্যবাদী হলে[১০৮৫] তাদেরকে ডাক ও তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক।

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۭ قُلِ ادْعُوْا شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيْدُوْنِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ ﴿۱۹۶﴾

১৯৬। তাদের কি পা আছে যা দিয়ে তারা চলে, অথবা তাদের কি হাত আছে যা দিয়ে তারা ধরে, অথবা তাদের কি চোখ আছে যা দিয়ে তারা দেখে অথবা তাদের কি কান আছে যা দিয়ে তারা শোনে? তুমি বল, 'তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদেরকে ডাক, এরপর সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে কৌশল আঁট আর তোমরা আমাকে অবকাশ দিও না। [১০৮৬]

اِنَّ وَلِيِّيَ اللّٰهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۚ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۹۷﴾

১৯৭। নিশ্চয় আমার অভিভাবক সেই আল্লাহ্ যিনি এ মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, এবং তিনিই সৎকর্মশীলদের অভিভাবক হয়ে থাকেন।

১০৮৫। এ আয়াত মূর্তি পূজারীদেরকে খোলাখুলিভাবে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ প্রদান করে যে, সকল জীবন্ত ও অচেতন বস্তু যাদেরকে তারা মা'বূদ বলে ডাকে, কখনই তাদের প্রার্থনার উত্তর দিতে পারে না। কারণ প্রতিমাসমূহ এ ক্ষমতাই রাখে না। কিন্তু জীবন্ত আল্লাহ্ তাঁর ভক্তদের দোয়া কবুল করে থাকেন।

১০৮৬। পূর্ববর্তী আয়াতের মধ্যে কাফিরদেরকে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান করা হয়েছিল একেই এ আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতে সম্প্রসারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের প্রচারাভিযানে তাদেরকে সাহায্য করতে তাদের প্রতিমাগুলোকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলা হয়েছে, তাদের সমস্ত উপায়-উপকরণ কাজে লাগাবার জন্য, তাদের যাবতীয় শক্তি জড় করে ইসলামের ওপর আক্রমণ করে তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য, তাদের কোন প্রচেষ্টা বা সম্ভাব্য কোন অবলম্বনই বাকী না রেখে আল্লাহ্র নবীকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে ক্ষণিকের তরেও সময় নষ্ট না করে, তারা দেখে দিক তাদের দৃঢ়-সংকল্প এবং সমবেত প্রচেষ্টা তাঁর কী ক্ষতি সাধন করতে পারে? আল্লাহ্তাআলা তাঁর নবীকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং তাঁর মিশনকে সফলতা ও বিজয় প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন (৫ঃ৬৮ ও ৫৮ঃ২২)।

হাদীস শরীফ

পরনিন্দা

কুরআন ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿۱۹﴾

অর্থাৎ সে কথা বলে না কিন্তু তার নিকটেই (সংরক্ষণের নিমিত্তে) একজন অতন্দ্র প্রহরী (ফিরিশ্তা নিয়োজিত) রয়েছে (সূরা ক্বাফ ঃ ১৯)।

হাদীস ঃ

আন ইব্নি আব্বাসিন আন্না রসূলাল্লাহে মার্‌রা বেকাররাইনি ফাক্বালা ইন্নাহুমা ইউআয্যাবানি ওয়ামা ইউআয্যাবানি ফী কারীরিন বালা ইন্নাহু কাবীরুন আম্মা আহাদুহুমা ফাকানা ইয়াম্‌শি বিন্‌নামীমাতি ওয়া আম্মাল আখারু ফাকানা লা ইয়াসতাতিরু মিল বাওলিহী - (বুখারী)।

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন; হযরত রসূল করীম (সঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাবার সময় বললেন, এ দু'ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে, তবে তা কোন বড় গুনাহ্র কারণে (বলে অনেকের নিকট মনে হবে) নয়। তবে হাঁ, বিষয়টি বড়ই। তাদের একজন পরনিন্দা / চোগলখুরী করে বেড়াত, আর অন্যজন পেশাব করার সময় পর্দা করত না (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ ব্যক্তি জীবনে মানুষ স্বাধীন। অনেকেই এ স্বাধীনতার মূল্যায়ন করে আর অনেকেই করে না। যারা মূল্যায়ন করে তারা জানে, যদিও আমি স্বাধীন তথাপি আমার জীবনের সফলতা এ স্বাধীনতাকে আল্লাহ্র আনুগত্যে বিলীন করে দেয়ার মাঝে নিহিত। আর স্বাধীন মানুষ খোদাতে বিশ্বাসী নয় অর্থাৎ নাস্তিক সে পাপ ও পুণ্য বুঝে না, বুঝতেও চায় না, তাই ভালো বা মন্দ কর্ম তার নিকট কোন মূল্য রাখে না। যারা আস্তিক ও নৈতিকতায় বিশ্বাসী তাদের নিকট প্রতিটি কর্মের মূল্য রয়েছে। তারা ছোট ছোট মন্দ বিষয়কেও বড় বলে মনে করে।

কুরআন সতর্ক করছে তোমরা যে কথাটিই বলো না কেন অথবা যে কর্মটিই করো না কেন আমাদের লোক নিয়োজিত আছে অর্থাৎ ফিরিশ্তাদের দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতিটি বিষয়কে সংরক্ষণ করেন। হিসাব কিতাবের দিন এ উপস্থিত করা হবে।

উপরোক্ত হাদীসে আল্লাহ্‌র নবী (সঃ) বড় পাপকে চিহ্নিত করছেন আর তা হলো কুটনামী গীবত বা পরনিন্দা সাধারণত সবাই এ কাজটি করে মজা পায়। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র নেক বান্দা তারা এ কাজে লিপ্ত হয় না। আমাদের সমাজে পরনিন্দা ও পরচর্চা অনেক বেশি। সাধারণত মানুষ এমনটি করা পাপ বলে মনে করে না। আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) আমাদের জানাচ্ছেন, তোমাদের দৃষ্টিতে পাপটি ছোট হলেও পরিণামের দিক হ'তে অনেক বড়।

দ্বিতীয় যে পাপটির কথা আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) উল্লেখ করছেন, তা হলো পায়খানা-প্রস্রাবের সময় পর্দা না করা। আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ) আমাদের জানিয়েছেন, লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। যে লজ্জা পরিত্যাগ করে সে যা ইচ্ছা তা করুক।

আসলে উপরোক্ত দু'টি পাপ এমন যা পরিণামে মানুষকে ঔদ্ধত্য ও নির্লজ্জ করে তুলে। এর ফলে আরো অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। তাই আল্লাহ্‌র রসুল আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন, আমরা যেন কোন পাপকেই ছোটো মনে না করি। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে সকল পাপ হতে সুরক্ষার তৌফীক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

চশমায়ে মসীহী

(১০ম কিস্তি)

ইহুদী ও খৃষ্টানদের পুরাতন পুস্তকে যদি আসহাবে কাহ্‌ফ প্রভৃতি গল্প দেখতে পাওয়া যায়, তারা যদি সেগুলোকে কৃত্রিম ও কাল্পনিক গল্প বলে ধারণা করে তবে তাতেই বা ক্ষতি কি? মনে করবেন এদের ধর্ম পুস্তক, ঐতিহাসিক পুস্তক ও স্বর্গীয় পুস্তকগুলো সম্পূর্ণ আঁধারে আবৃত। আজকাল ইউরোপ এ গ্রন্থাবলী নিয়ে কত শোকাকুল সরল স্বভাব নর-নারীরা কীরূপে স্বতঃই ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, কত বড় বড় গ্রন্থ ইসলামের পৃষ্ঠ-পোষকতায় লিখতে হচ্ছে, আপনি হয়ত তা অবগত নন। আমেরিকা প্রভৃতি দেশের কয়েকজন খ্রীষ্টান তজ্জন্যই আমাদের বিধানে প্রবেশ করেছেন। অসত্য কতদিন আবৃত অবস্থায় থাকতে পারে? ভেবে দেখুন খোদার ওহীতে এরূপ পুস্তক হ'তে বর্ণনা উদ্ধৃত করার কী আবশ্যকতা? স্মরণ রাখবেন, এরা চক্ষুহীন, এদের যাবতীয় পুস্তক জ্যোতিহীন ও আঁধারময় কুরআন আরব উপদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছিল, আরবের অধিবাসীরা সাধারণতঃ খ্রীষ্টান ও ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের কোন সংবাদই রাখত না। হযরত (সঃ) নিজেও উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন। এসব কথা জেনে-শুনেও যারা সেসব অপবাদ মহাপুরুষের প্রতি আরোপিত করে তাদের অন্তরে অণুমাত্রও ঈশ্বর ভীতি নেই। হযরতের (সঃ) বিরুদ্ধে এ আপত্তি উত্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত হলে, হযরত ঈসার (আঃ) বিরুদ্ধে কতই না আপত্তি উত্থাপিত হবে? যীশু এক বনী ইস্রাইলী মওলানা সাহেবের নিকট তওরাত কিতাব এক এক করে পাঠ করে পড়ে নিয়েছিলেন, 'তালমূদ' ও ইহুদীদের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছিলেন, তার ইঞ্জীল বস্তুত বাইবেল ও তালমূদের বাক্যে এত পরিপূর্ণ যে, ইঞ্জীলের সত্যতা সম্বন্ধে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হয়! আমরা শুধু কুরআন শরীফের আদেশে পালনেই এতে বিশ্বাস করি। দুঃখের বিষয় পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে মজুত নেই এমন একটি কথাও ইঞ্জীলে নেই। কুরআন যদি বাইবেলের ভিন্ন ভিন্ন সত্য কথা, সত্য নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধীয় অন্যান্য যাবতীয় সত্য একত্র করে থাকে তবে তাতেই বা কি নির্বোধের কাজ করা হয়েছে এবং কি অনিষ্টের সূচনা করা হয়েছে? কুরআন শরীফের কাহিনী ও গল্প শুধু ওহী বা দৈববাণী হতেই প্রাপ্ত। তা কি আপনার মতে অসম্ভব? হযরত (সঃ)-এর সমীপে ওহী বা আকাশবাণীর অবতরণ অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সুসিদ্ধ ও প্রমাণিত; তাঁর সত্য নবুওয়ত ও প্রেরিত হওয়ার আলোক, আশীর্বাদ ও বরকত আজ পর্যন্তও বিকশিত হচ্ছে। তবে নাউযুবিল্লাহ্‌, কুরআনের কোন কোন গল্প পূর্ববর্তী গ্রন্থ বা শিলালিপি হতে নকল করা হয়েছে, এ শয়তানী ধারণা কী হৃদয়ে কখনও স্থাপন করা সম্ভবপর হয়? খোদাতাআলার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি আপনার কোন সন্দেহ জন্মেছে? আপনি তাঁকে অন্তর্যামী ও সর্বজ্ঞ বলে কি অবগত নন? ইহুদী ও খৃষ্টানগণ কোন কোন গ্রন্থকে মৌলিক ও কোন কোন গ্রন্থকে কৃত্রিম বলে নির্দেশ করেন; কিন্তু এটা তাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব অভিমত। আমি ইতোপূর্বেই বলেছি, তারা কোন মৌলিক গ্রন্থের মৌলিকতা দেখতে পায় নি কোন কৃত্রিম পুস্তকের কৃত্রিম লেখককে ধরে দিতে পারে নি। এ বিষয়ে ইউরোপীয় বহু সমালোচক মহা পণ্ডিতের সাক্ষ্য আমার নিকট মজুদ আছে। তারা অতি অন্ধ। তাদের বিশ্বাস-জ্যোতিঃ সম্পূর্ণ নির্বাপিত। যে খ্রীষ্টানগণ পদার্থ বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলনে তিমির সাগরে নিমজ্জিত ও আসমানের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী তারাই আবার যীশু খ্রীষ্ট জড়দেহে আকাশে উপবিষ্ট, এ বিশ্বাস পরিপোষণকারী। হায়! এদের জন্য কত পরিতাপ। বস্তুত ইহুদীদের আদিম ধর্ম পুস্তকগুলো সত্য হলে এদের উপর নির্ভর করে হযরত ঈসা (আঃ)-কে নবী বলা যায় না। দেখুন তিনি যে মসীহে মাওউদের দাবী করেছিলেন, মালাকী নবীর গ্রন্থানুসারে তাঁর আগমনের পূর্বেই ইলিয়াস নবীর আসমান হ'তে অবতরণের একান্তই আবশ্যক ছিল। কিন্তু কোথায় সেই ইলিয়াস? তিনি এখনও অবতীর্ণ হন নি। ফলতঃ এটা ইহুদীদের অতি প্রবল যুক্তি। হযরত ঈসা এর খুব স্পষ্ট উত্তর দিতে পারে নি। হযরত ঈসাকে নবী বলে কুরআন শরীফ তাঁর মহোপকার সাধন করেছে। হযরত ঈসা নিজেই খ্রীষ্টানদের প্রায়শ্চিত্ব বাদের খন্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, "ইউনুস নবী তিন দিবস মাছের পেটে সজীব রয়েছিলেন, আমি তাঁরই সদৃশ"। ঈসা নবী বাস্তবিকই ... মরে থাকেন তবে ইউনুস নবীর সাথে তাঁর সাদৃশ্য কোথায়? তাঁর সাথে তাঁর সম্বন্ধই বা কী? হযরত ঈসা যে ক্রুসে মরেন নি, শুধু সংজ্ঞাহীন মৃতবৎ ছিলেন, তা-ই এ উপমায় প্রতিপন্ন হয়। 'মরহমে ঈসা' নামক যে বিখ্যাত ঔষধের ব্যবস্থা প্রায় সমুদয় হাকিমী চিকিৎসা গ্রন্থেই পাওয়া যায় তার শিরোনামে লিখিত আছে যে হযরত ঈসার জন্যই অর্থাৎ তাঁর ক্ষত আরোগ্য করার নিমিত্ত সর্বপ্রথম এ ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল।

ঘরের ভিতরে যদি করে কেউ বাস
হবে এতেই যাহা করিলাম ফাস (চলবে)

অনুবাদ- মোহাম্মদ আজিমউদ্দীন
চলিতকরণ ও সম্পাদনা - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

আল্লাহ্‌র 'নূর' সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১১ অক্টোবর, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআ'উয, ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আত্ ত্বলাকের নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা দিয়েছেন ঃ

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۛ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۙ

رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ۝

গত খুতবায় আল্লাহ্‌র সিফত 'নূর' সম্পর্কে আলোচনার জন্য সূরা ত্বলাকের ১১, ১২ নং আয়াত তিলাওয়াত করে যে আলোচনা আরম্ভ করেছিলাম তার কিছু অংশ আরো বাকী রয়েছে। তা আজকে আলোচনা করছি।

আল্লামা ফখরুদ্দীন ইমাম রাজী উক্ত আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ "অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে নিয়ে আসার অর্থ এই যে, কুফরীর অন্ধকার (নবীকে অস্বীকার করা) থেকে ঈমানের নূরের দিকে নিয়ে আসা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে দলিল ও যুক্তি প্রমাণের আলোতে নিয়ে আসা, অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোর দিকে নিয়ে আসা।"

তফসীর কাশ্‌শাফের প্রণেতা আল্লামা যমখ্‌শরী লিখেছেন, এখানে রসূল অর্থ হযরত জিবরাঈল (আঃ) এবং যিক্‌র অর্থ সম্মান। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, **ওয়া ইন্নাহু লাযিক্‌রুল্ লাকা ওয়া লিক্বওমিকা**। যিক্‌র অর্থ কুরআনও হতে পারে যেমন আল্লাহ্ অন্য এক আয়াতে বলেছেন, ওয়া আনযালনায্ যিক্‌রা। এখানে যিকর অর্থ কুরআন মজীদ।

আল্লামা আলুসি লিখেছেন, (সূরা ত্বলাক ঃ ১১) **ক্বাদ আনযালা ল্লাহো ইলায়কুম যিকরান** - এখানে যিক্‌র অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সঃ), কারণ হুযূর (সঃ) অনেক বেশি তেলাওয়াত করতেন এবং অনেক বেশি মানুষকে কুরআনের তবলীগ করতেন- এজন্য তাঁকে (সঃ)-কেও যিক্‌র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তারপর যে 'রসূল' শব্দ এসেছে এটি যিক্‌র শব্দেরই বদল হিসাবে অর্থাৎ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং রূপক অর্থে

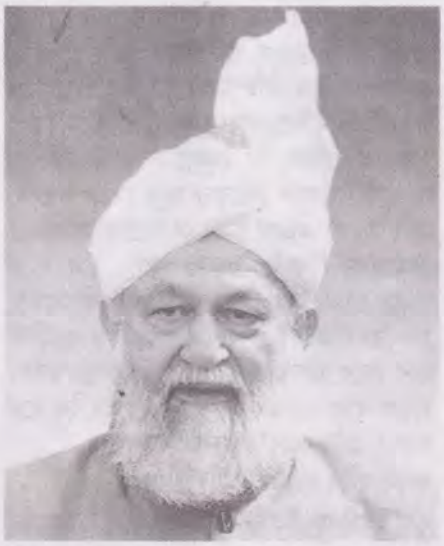

(এরসাল) প্রেরণ (রসূল প্রেরণ) এবং (এনযাল বা যিক্‌র নাযেল) অবতীর্ণ একই অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

আল্লামা আবুল হাইয়ান বলেছেন, 'একথা খুবই স্পষ্ট যে, যিক্‌র অর্থ কুরআন ও রসূল অর্থ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)" (রূহুল মা'আনী)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, 'যিকরান্' অর্থ আল্লাহ্ এমন কিতাব নাযেল করেছেন যার অনুসরণে তোমার স্মরণ বা তোমার উল্লেখ প্রচার ও প্রসিদ্ধি লাভ করবে তোমার মহিমা ও গৌরব বিস্তার লাভ করবে।' রসূল অর্থ ঃ 'তোমরা দেখতে যদি চাও তবে দেখ, এর সম্পর্ক কী, তোমরা এ রসূলের উদাহরণ ও নমুনা দেখ। তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াত পড়ে পড়ে শোনান। ফলে আল্লাহ্ তাঁকে (সঃ) কত বড় সম্মান প্রদান করেছেন।"

মিনায যুলুমাতে ইলান নূর - অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসা"-এর অর্থ এই যে, এ রসূল (সঃ)-এর আনুগত্য এবং এই কুরআনের আদেশ অনুসারে আমল (কার্যক্রম) করলে তার ফল হবে এই যে, তোমরা অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর মাঝে প্রবেশ করবে" (হাকায়েকে ফুরকান, ৪র্থ খন্ড; পৃঃ ১৪৩)।

"অন্ধকারের যুগে অন্ধকার দূর করতে খোদাতাআলার পক্ষ থেকে নূর নাযেল হয়। তাঁর সে নূর তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাব। খোদাতাআলা নূর দিয়ে সেসব মানুষকে পথ প্রদর্শন করেন যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়। সুতরাং আল্লাহ্ তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর মাঝে নিয়ে যান এবং সোজা রাস্তার দিকে পথ প্রদর্শন করেন" (রূহানী খাযায়েন; ১ম খন্ড; পৃঃ ৬৪৮)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লিখেছেন;

"অতএব আমি সর্বদা অবাক দৃষ্টিতে দেখি যে, এ আরবী নবী, যাঁর নাম মুহাম্মদ (তাঁর উপর হাজার হাজার দুরূদ ও সালাম) তিনি কত উচ্চ পর্যায়ের নবী!

তাঁর উচ্চ মর্যাদার সীমা অনুমান করা সম্ভব নয় ও তাঁর পবিত্রকরণ শক্তির অনুমান করাও মানুষের কাজ নয়।

এ সকল তত্ত্ব-জ্ঞানের ভান্ডার তাঁকে দান করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তাঁর মাধ্যমে পায় না সে চিরবঞ্চিত। আমরাই বা কি এবং আমাদের মূল্যই বা কি? আমরা নেয়ামতের অস্বীকারকারী হব যদি স্বীকার না করি যে, আমরা প্রকৃত তওহীদ এ নবীর মাধ্যমে এবং জীবন্ত খোদাকে আমরা এ কামেল নবীর মাধ্যমে ও তাঁর জ্যোতির দ্বারা সনাক্ত করেছি। খোদার সাথে বাক্যালাপ ও সম্বোধনের সৌভাগ্য, যার সাহায্যে আমরা তাঁর চেহারা দেখি, তা-ও আমরা এ সম্মানিত নবীর মাধ্যমেই পেয়েছি। হেদায়াতের এ সূর্যের আলো রৌদ্রের ন্যায় আমাদের ওপর পতিত হয় এবং সে সময় পর্যন্ত আমরা আলোকিত থাকতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাঁর সম্মুখে দন্ডায়মান থাকি" (হাকীকাতুল ওহী পৃঃ ১১৪, বাংলা অনুবাদ পৃঃ ৮৬, ৮৭)।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"হে আমার প্রভু! (হে আমার মালিক!) আমার জাতির পক্ষে আমার দোয়া তুমি কবুল কর, আমার ভাইদের পক্ষে আমার ক্রন্দনময় প্রাণ বিগলিত আকুতিকে কবুল কর। আমি তোমার দরবারে তোমার প্রিয় নবী খাতামান্ নাবীয়ীন (সঃ) যিনি শাফায়াতকারী, তাঁর শাফায়াতের দোহাই দিয়ে মিনতি করছি, আরজ করছি - হে আমার মালিক! তুমি এদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আস এবং মরুভূমির দুরত্ব থেকে বের করে নিজ সান্নিধ্যে আন" (দাফেউল ওসাভেস, রূহানী খাযায়েন; ৫ম খন্ড; পৃঃ ২২)।

ইলহাম ঃ "হে আমার প্রভু, আমাকে তুমি সেই নূরসমূহ দেখাও যা সবকিছুকে ঘিরে ফেলে, বেষ্টন করে রাখে। আমি তোমাকে উজ্জ্বল আলোকিত করেছি এবং তোমাকে আমার সান্নিধ্যে নিয়ে নিয়েছি। শীঘ্রই আকাশ থেকে একটি আদেশ প্রদান করা হবে যা তোমাকে আনন্দিত করবে" (তাযকিরাহ্ পৃঃ ৬২৩)

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ১৫ই নভেম্বর ২০০২ইং)

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

আল্লাহ্‌র 'নূর' সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১৮ অক্টোবর, ২০০২ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআ'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করে খুতবা দিয়েছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

অনুবাদ ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা কর- খাঁটি তওবা। অচিরেই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের কর্মের অনিষ্টসমূহ তোমাদের থেকে দূর করে দিবেন। এবং তোমাদিগকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে। সেদিন আল্লাহ্ তাঁর এ নবীকে এবং তাদেরকে যারা তার সাথে ঈমান এনেছ অপমানিত করবেন না। তাদের নূর তাদের সম্মুখে এবং তাদের ডান দিকে ছুটতে থাকবে; তারা বলবে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ কর এবং আমাদেরকে ক্ষমা কর! নিশ্চয় তুমি সকল কিছুর উপরে সর্বশক্তিমান" (সূরা তাহরীম ঃ ৯)।

হযরত আবূ যার (রাঃ) এবং হযরত আবূ দরদা (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিন আমি সকল উম্মতের মাঝে নিজ উম্মতকে চিনে নিতে পারব। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) আরয করেছিলেন, 'হে রসূলাল্লাহ্! আপনি কীভাবে আপনার উম্মতকে চিনবেন? হুযূর (সঃ) বললেন, আমি তাদের এভাবে চিনব যে তাদের আমলনামা (কর্মফলের বিবরণী রেকর্ড) তাদের ডান হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে। তাছাড়া তাদের আনুগত্যের সুফলস্বরূপ তাদের মুখমন্ডলে নূরের চিহ্ন প্রকাশিত হতে দেখে তাদের চিনতে পারব। তাছাড়া তাদের সম্মুখে এবং তাদের ডানে তাদের নূর প্রবাহিত হতে থাকবে, সেটা দেখে" (মুসনাদ আহমদ)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

যারা ইহজীবনে ঈমানী নূর লাভ করবে, কিয়ামতের দিন তাদের নূর তাদের সম্মুখে এবং তাদের ডানে ছুটবে এবং সর্বদা বলতে থাকবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমাদের নূরকে পূর্ণ কর এবং নিজ থেকে আমাদেরকে ক্ষমা কর, তুমি সকল বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।"

আলোচ্য আয়াতে এ যে বলা হয়েছে, তারা সদাসর্বদা বলতে থাকবে, "হে আমাদের প্রভু! আমাদের নূরকে পূর্ণ কর" এখানে অপরিসীম অগ্রগতির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। একটি পূর্ণতা, তাদের নূরের একটি পূর্ণতা যখন তারা প্রাপ্ত হবে তখন দ্বিতীয় একটি উচ্চতা তারা লক্ষ্য করবে। দ্বিতীয় নূরের উচ্চতাটি দেখার পর তারা মনে করবে, প্রথম উচ্চতাটি অসম্পূর্ণ। অতএব এখন তারা এ দ্বিতীয় উচ্চতাটি লাভের জন্য মুনাজাত করতে থাকবে। যখন দ্বিতীয় উচ্চতাটি তারা পেয়ে যাবে তখন তারা তৃতীয় আর একটি নূরের উচ্চতা লক্ষ্য করবে। এখন তৃতীয় উচ্চতাটি দেখার পরে পূর্বের দ্বিতীয় উচ্চতাটিকে তারা অসম্পূর্ণ মনে করবে। অতএব এখন তারা এ তৃতীয় উচ্চতাটি লাভের জন্য মুনাজাত করতে থাকবে। 'আমাদের নূরকে পূর্ণ কর' থেকে সীমাহীন অগ্রগতি ও উন্নতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সুতরাং সীমাহীন উন্নতি ও অগ্রগতি চলতে থাকবে। কখনও অবনতি বা অধঃপতন হবে না। তাদেরকে জান্নাত হ'তে বহিষ্কৃত করা হবে না। বরং প্রতিদিন অগ্রগতি ও উন্নতি হতে থাকবে কখনই পেছনে হটতে হবে না। ... জান্নাতীরা আকাঙ্ক্ষা করতে থাকবে আরো অগ্রগতির এবং এভাবে তারা পুরোপুরি নূরের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাবে (ইসলামী নীতিদর্শন) (রূহানী খাযায়েন, ১০ খন্ড; পৃঃ ৪১২)।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন, ২২ নভেম্বর ২০০২ইং)

অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

পর্ব ২ ঃ অধ্যায় ঃ ৩

কনফূসীয় মতবাদ

কনফূসীয় মতবাদ মূলত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক গুপ্তধনস্বরূপ, এবং এ মতবাদের ওপর আলোকপাত করলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যুক্তিবাদী, ঐশী আদর্শ মূল্যবোধ জ্ঞানের সঠিক প্রতিফলনই শুধু মানুষকে সত্য পথ প্রাপ্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। চীন দেশের অনেক লোক পৃথিবীর অন্যান্য ঐশী ধর্মের অনুরূপ একেও একটি ঐশী শিক্ষা বলে বিবেচনা করে, তবে আবার অনেক এমন লোকও আছে যাদের মতে এটা একটা নিছক দর্শন। তেমনিভাবে জাপানের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কনফূসীয় মতবাদ কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমারেখায় আবদ্ধ নয়, বরং টাও মতবাদ (Taoism), শিন্টো মতবাদ (Shintoism), এবং বৌদ্ধ মতবাদের মতই এটা দর্শনের একটি সাধারণ বিষয়।

সে যাক্ গে। ধর্ম বা দর্শন-যে নামেই একে অভিহিত করা হোক্ না কেন, আমাদের কাছে যেভাবে এ শিক্ষা ও আদর্শ প্রতিফলিত হয়, তাহলো এতে খোদার অস্তিত্বের স্বীকৃতি। যদিও আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ৫৫০ থেকে ৪৭৮ খ্রীষ্টপূর্বে জন্মগ্রহণকারী কনফূসীয়সের খুব কম সংখ্যক অনুসারীই সঠিক অর্থে ঐশী অস্তিত্ব ও বিশ্বাসকে আজকের দিনে মেনে চলে। তবে আত্মা বা রূহের জগতকে (World of spirits and souls) তারা বিশ্বাস করে এবং অনেকের মাঝে পূর্ব-পুরুষদের পূজা (Ancestor worship) ও পরিলক্ষিত হয়।

এ বিষয়ে প্রাচীন রচনাবলীর বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, কনফূসীয় মতবাদ ও আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের চিরায়ত ধর্মীয় রীতিকে স্বীকার করেছে। বরং ঐশীবাণীকে কেন্দ্র করে এ দর্শন বা প্রজ্ঞা যতটুকু বিকশিত হয়েছে, তা চিন্তাপ্রসূত জ্ঞানী লোকদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা বা উপলব্ধি থেকে অনেক বেশি গৌরবজনক। তবে যুগের বিবর্তনে অন্যান্য ঐশী ধর্মেও যেমন বিকৃতি এসেছে, তদ্রূপ কনফূসীয় মতবাদও তার মূল শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। বহু

কুসংস্কার এবং বিভ্রান্তিমূলক আচরণ এক পরম শক্তিধর ঈশ্বরের (Supreme God) বিশ্বাসের পরিবর্তে চালু হয়েছে। যদিও এটা বড়ই পরিতাপ ও দুঃখজনক বিষয়, কিন্তু ধর্ম জগতে এর পুনরাবৃত্তি প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ব-পুরুষদের পূজা সংক্রান্ত বিষয়ে কনফূসীয় মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা তাদেরকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে না, তবে তাদের নিকট কোন অনুগ্রহ তারা প্রায়শই কামনা করে (Beg favours from them)। জাপানের অনুসারীদের নিকট বরং এ উপলব্ধিটি মৃত পূর্ব-পুরুষদের স্মরণ বা সন্ধানের প্রকাশ ভঙ্গীর মাঝেই সীমাবদ্ধ। আসল কথা হলো, প্রকৃতি ও বিশ্ব-জগতের বিভিন্ন সৃষ্টির অন্তরালে নিশ্চয়ই একজন স্রষ্টার হাত কার্যকর রয়েছে। এটা মানুষের একটা সহজাত আকুতি যে সেই স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্ক ও যোগাযোগ রচিত হোক, আর ঐশীবাণীই হলো সেই মাধ্যম বা পথ যার আলোতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সেই সংযুক্তি সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু যখন কোন কারণে এ যোগাযোগ অকার্যকর হয় বা স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কের মাঝে কোন শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তখন মানুষের সেই সহজাত চাহিদাই অন্য কোন ব্যক্তি, আত্মা বা অশরীরী বস্তুকে আশ্রয় করে ঈশ্বরের সন্ধান করে। তাই, এ জাতীয় কুসংস্কারে বিশ্বাস কোন অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং অন্ধকার যুগে অধোগামী মানুষের ঈশ্বর সন্ধানেরই এক দুঃখজনক পরিণতি মাত্র। পার্থক্য হলো, যে সঠিক খোদাতে বিশ্বাস-কালীন সময়ে মানুষের ইতিবাচক ব্যবহার বা আচরণগত পরিবর্তন ঘটাতে হয়। মনুষ্যত্ব অর্জন ও দায়বদ্ধতার মাধ্যমে মানুষ বিবেক ও নৈতিকতা অর্জনে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে। আর অন্ধকার বা কুসংস্কারক্লিষ্ট সময়ে মানুষ এ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। কেননা, তারা কোন নৈতিক বা ধর্মীয় বিধানের আনুগত্য প্রদর্শন করেনা-

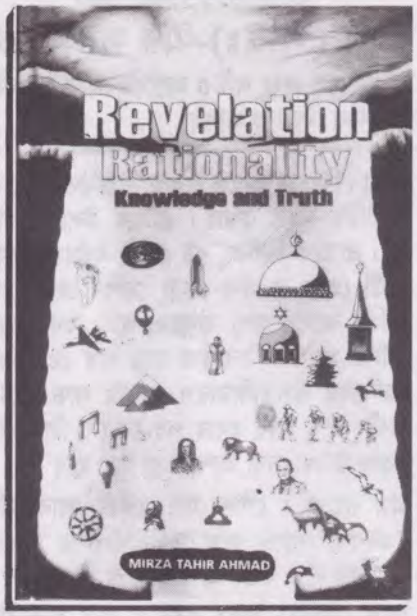

(Demand no submission to any moral religious code)।

আমরা কনফূসীয় বিশ্বাস ও আচরিত রীতি-নীতির উৎস সম্পর্কে জানবার জন্য যদি ক্লাসিকাল রচনাদির (Classical confucian literature) শরণাপন্ন হই, তাহলে এটা প্রমাণ করা খুবই সহজ যে কনফূসীয় মতবাদ কোন মানব-রচিত দর্শন বা সংস্কৃতি জাতীয় বিষয় নয় (Confucianism is not a man-made philosophy at its origin), বরং অন্যান্য ঐশী ধর্মের মতই এক অবিনশ্বর অস্তিত্ব থেকে এর উদ্ভব হয়েছে। (It did emboace the idea of one immortal God)। 'স্বর্গ' (Heaven) শব্দের মাধ্যমে সেই অবিনশ্বর অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করা হয়েছে, অর্থাৎ কনফূসীয় বিশ্বাস অনুযায়ী স্বর্গ ও ঈশ্বর সমার্থক শব্দ মাত্র। তাছাড়া, কনফূসীয় মতবাদে প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধির জন্য সেই পরম অস্তিত্বের গুণাবলীকে হৃদয়ঙ্গম করা (Understanding the attributes of God) এবং ব্যক্তির আচরণে তার যথার্থ প্রয়োগ ঘটানোর কথা বলা হয়েছে- (Adopting then in one's own conduct)। সকল ধর্মমতেই একথা সমানভাবে সত্য।

তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে, কনফূসীয় মতবাদ চীনের আরো বহু প্রাচীন সাধু ও ভাব-বাদীদের ধারাবাহিকতারই একটি অংশ বিশেষ। এদের মাঝে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফূ সী (Fu Hsi) (৩৩২২ খ্রীষ্টপূর্ব) ইউ (Yu), (২১৪০ খ্রীষ্টপূর্ব), ওয়ান (Wan), (খ্রীষ্টপূর্ব ১১৪৩) এবং চেউ কুং (Cheu Kung), (১১২০ খ্রীষ্টপূর্ব)। এদের মাঝে কেউ কেউ ছিলেন বিখ্যাত রাজা, কেউ বা সাধক, আবার কেউ বা দু'টোই, যেমন, Fu Hsi। বলা হয় যে, Fu Hsi ঐশী-বাণী লাভ করতেন এবং তার ভিত্তিতেই চীনের বিখ্যাত গ্রন্থ The Book of changes, যা Yi King নামেও পরিচিত, রচিত হয়েছিল। পরবর্তীতে চীনের কৃষি, শিল্প, ঔষধ, অর্থনীতি ও অন্যান্য জ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে উক্ত পুস্তক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় এ্যাকুপাংচার (Acupuncture) সম্পর্কিত ধারণা বিকাশে এক পথিকৃৎ বলে অভিহিত করা হয়। তবে কারো কারো মতে চিকিৎসার উক্ত শাখাটি আরো পরে অন্য একজন সাধক রাজা Huang Ti কর্তৃক বিকশিত হয়েছিল, যিনি অবশ্য Yi King থেকেই এ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছিলেন। তদ্রূপ মাষ্টার Sun কর্তৃক রচিত Art of War, যা পৃথিবীর সর্বত্র সামরীক বলয় খুবই সমাদৃত পুস্তক, তার উৎস হিসাবে উক্ত Yi King এর পটভূমিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

কনফূসীয় মতবাদ অনুযায়ী বিধিবদ্ধ পড়াশুনা বা ডিগ্রী অর্জন সত্য উপলব্ধি বা প্রাপ্তির জন্য কোন আবশ্যকীয় বিষয় নয়। খোদাই স্বয়ং সত্য, এবং তার সৃষ্টিকে তিনি সর্বদা অনুগৃহীত করে থাকেন, এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝেই তিনি বিরাজমান। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মানব-প্রকৃতি এবং চিরায়ত সত্যের অবস্থান কনফূসীয় মতবাদ অনুযায়ী খুবই কাছাকাছি। (চলবে)

অনুবাদ - অধ্যাপক আমীর হোসেন

'আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

বাংলা ভাষা-ভাষীদের সাথে হুযূর (আইঃ)-এর সাক্ষাৎকার

(১৭-১২-০২ তারিখে এমটিএ'র মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত এবং অডিও ক্যাসেট থেকে সংকলিত। অনুবাদকের কাজ করেন মাওলানা ফিরোজ আলম)

প্রশ্ন নং ১ ঃ ইসলাম ধর্মে আহ্‌লে কিতাব মহিলার সাথে বিবাহ জায়েয। এর অর্থ কি এই যে, সে মহিলাকে এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী হতে হবে? অথবা সে ঈসা (আঃ)-কে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আহলে কিতাবের যত প্রকার অর্থ হতে পারে সব অর্থে একজন মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয। তিনি একত্ববাদী হতে পারেন বা হযরত ঈসা (আঃ)-কে খোদার পুত্র বলে বিশ্বাস করতে পারেন।

প্রশ্ন নং ২ ঃ পবিত্র কুরআনের সূরা হিজর ১৯ আয়াতে পড়ে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এখানে বলা আছে কেউ যদি চুরি করে আল্লাহ্‌তাআলার কোন কথা শুনার চেষ্টা করে তো সেই অপরাধীর পেছনে একটা উল্কা নিক্ষেপ করা হয়। এ আয়াতে 'চুরি করে শুনার অর্থ' দয়া করে একটু ব্যাখ্যা করুন। মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব আয়াতটি পাঠ করে অর্থ করেন।

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা আক্ষরিক অর্থ নয় রূপক অর্থে বলা হয়েছে। এখানে চুরি করে শুনার অর্থ হলো, আল্লাহ্‌তাআলার যে কথা তিনি নাযিল করেছেন তাথেকে কেউ চুরি করে ধারণ করে বা তদনুযায়ী নিজের কথাকে সাজায়। উল্কা পিন্ডের পেছনে জ্বলন্ত আগুনকে **শিহাবুম মুবীন** বলা হয়।

প্রশ্ন নং ৩ ঃ পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শেষে অনেকেই কুরআনকে চুমু দেয় এটা কি বৈধ? কীভাবে, কখন থেকে এই প্রথা উৎপত্তি হয়েছিল?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ পবিত্র কুরআন গ্রন্থকে চুম্বন করা জায়েয। আমি এটা করে থাকি তবে সুন্নত হিসেবে করি না। বলা কঠিন কবে থেকে এ নিয়ম চালু আছে। এবং এটা কি সুন্নাত তা-ও আমি বলতে পারবো না। কিন্তু কুরআন মজীদ গ্রন্থকে চুমু দিলে কোনো দোষ নেই।

[এরপর মরহুম মৌলভী সলীম উল্লাহ্‌ সাহেবের পুত্র নিজের বাবার লিখিত একটি বাংলা নযম গেয়ে শুনান, যার শিরোনাম ছিল "খাতামান্‌ নাবীঈন।]

প্রশ্ন নং ৪ ঃ পবিত্র কুরআনে সূরা রা'দ এর ৩৯ আয়াতে **লিকুল্লি আজালিন কিতাব**-এর অর্থ কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এর অর্থ হলো অটল, অবশ্যম্ভাবী। **আজল** অর্থ সর্বোচ্চ সময় সীমা। কিতাব বলতে একটা নির্ধারিত সময় বা নির্ধারিত মুহূর্ত বুঝায়। এটাকে টলানো যায় না। প্রত্যেক জিনিষ, বই হোক, ধর্মগ্রন্থ হোক, গাড়ী হোক বা অন্য কোন মেশিন হোক এক নির্দিষ্ট কলের জন্য বানানো হয়। যখন সেই নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তো সেই জিনিসের উপকারিতারও সমাপ্তি লাভ ঘটে। অর্থাৎ আয়ু শেষ হবার পর কোনো জিনিসের থেকে উত্তম সেবা আশা করা ঠিক হবে না।

প্রশ্ন নং ৫ ঃ শোনা যায়, কোন লোক যদি "ওমরাহ্‌" পালন করে তো তার ওপর "হজ্জ" ওয়াজিব হয়ে যায়। এ ধারণা কি ঠিক?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ না। ব্যাপারটা হচ্ছে, 'ওমরাহ্‌' তো বছরের যে কোনো সময় করা যায় কিন্তু হজ্জ-এর একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে তার ওপর তো 'হজ্জ' অবশ্যই ফরয। অতএব ওমরাহ পালন করলেই হজ্জ ফরয এটা না বলে বলা উচিত যে, আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামর্থ্য থাকলে প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির ওপর হজ্জ ফরয।

প্রশ্ন নং ৬ ঃ পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার আয়াতুল কুর্সীতে আরবী শব্দাবলী **ইল্লাবিমা শায়া** ব্যবহৃত হয়েছে। সেই শব্দগুচ্ছ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ আল্লাহ্‌তাআলা নিজের জ্ঞানের সীমাহীন ভান্ডার থেকে যাকে ভালবাসেন যাকে চান তাকে কিছু জ্ঞান দিয়ে থাকেন। তারা নবী ও রসূল। কোনো মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব নয় যে, সে নিজের চেষ্টা দ্বারা আল্লাহ্‌র সমস্ত জ্ঞান লাভ করে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ হতে পারবে।

এ পর্যায় হুযূর একটা মজার কথা বলেন, "এক গ্রাম্য মৌলভী তাঁর আসে-পাশের লোকদিগকে একদিন বললো, মুর্খরা বলে মহানবী (সঃ)-এর যুগে টেবিল-চেয়ার ছিল না; এ দেখুন পবিত্র কুরআনে আয়াতুল্‌ কুরসী অন্তর্ভুক্ত আছে আর কুরসী তো সবাই জানে উর্দূ ভাষায় চেয়ারকে বলা হয়।

প্রশ্ন নং ৭ ঃ বেহেশ্‌তে প্রবেশের জন্য নিম্নতম যোগ্যতা কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ সেটা হচ্ছে আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যদি কারও প্রতি সন্তুষ্ট হন তো সেই ব্যক্তি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ্‌তাআলা যদি কারও উপর অসন্তুষ্ট হন তো সেই অভাগা হাজার চেষ্টা করলেও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

প্রশ্ন নং ৮ ঃ আজকাল যারা সেনাবাহিনীতে চাকুরী নেয় প্রশিক্ষণের সময় তাদেরকে এমন এমন কাজ-কর্ম শেখানো হয় যেগুলোকে নির্যাতন বা শত্রুর উপর অমানুষিক জুলুম বলে মনে হয়। এ ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা কি ভাল?

হুযূর (আইঃ) দৃষ্টান্ত জানতে চাইলে বলা হয় কমান্ডো ট্রেনিং

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ নতুন সৈনিক বা সেনা অফিসারগণকে কী ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে এটা তো উঁচু পর্যায়ে নির্ধারিত করা হয়। আমার মনে হয়, নীতি-নির্ধারকরা দেখেছেন যে, সম্ভাব্য শত্রু সে ধরনের নির্যাতন চালাতে পারে তাই তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন যে, যুদ্ধে প্রেরণের পূর্বে নিজেদের লোকদের প্রশিক্ষণ দিবেন যেন শত্রুর হাতে পড়লে আত্মরক্ষার জন্য সে সেই ধরনের কলা-কৌশল ব্যবহার করতে পারে।

প্রশ্ন নং ৯ ঃ অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে, একটি হাদীস আছে ঃ তোমরা কাল বা সময়কে গালি-গালাজ কর না। এর আসল অর্থ কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ সম্পূর্ণ হাদীসের অর্থ হচ্ছে ঃ "তোমরা সময়কে গালি-গালাজ কর না কারণ সময় মানে আল্লাহ্‌।" সময় বা যুগকে গালি দেয়া অর্থ আল্লাহ্‌কেই গালি দেয়া। কেননা, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কিছুই নেই।

প্রশ্ন নং ১০ ঃ মহিলাদেরকে নাকি পাঁজরের হাড় থেকে তৈরী করা হয়েছে। এ কথার অর্থ কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা বাইবেলে লেখা হয়েছে। কুরআন শরীফে এ ধরনের ভুল কথা নেই। কোন কোন হাদীসে এ কথা বলা হয়েছে। মহিলাদের মাঝে একটা বৈশিষ্ট্য থাকে যাকে নখরা বা বক্রতা বলা হয়। তাদের বেশি বেশি খোঁটা দিলে তারা আরও বেশি অযৌক্তিক

কথা-বার্তা বা কাজ করতে আরম্ভ করে। মহিলাদের এ ধরনের বক্রতা জোর করে দূর করার চেষ্টা না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রশ্ন নং ১১ ঃ আমরা জানি খৃষ্টানরা ২৫শে ডিসেম্বরকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মদিন বলে। আমি জানতে চাই হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বর? আর এ বিষয়ে ঐতিহাসিক বাস্তবতা কী?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা ভুল রীতি চলে আসছে। হযরত ঈসা (আঃ) যখন জন্মগ্রহণ করেন সেই সময় খেজুর গাছের ফল পেকে ছিল অর্থাৎ সেটা ছিল গ্রীষ্মকাল।২৫শে ডিসেম্বর খেজুর পাকে না। খৃষ্টানরা আনন্দ ফূর্তি করার জন্য ভিত্তিহীনভাবে ২৫ ডিসেম্বরকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মদিন বলে। আজকে খৃষ্টানরা জন্ম দিন হিসেবে যা পালন করে থাকে তা অজ্ঞতার যুগে Thread-এর রীতিনীতি। তার জন্ম তারিখের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সূর্যের যারা পূজা করতো তারা এরকম উৎসব পালন করতো। পরবর্তীকালে খৃষ্টানরা একে গ্রহণ করে নেয়। আসলে জন্ম দিনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন নং ১২ ঃ যদি কেউ বিতর নামায পড়ার সময় দোয়ায়ে কুনুত্ পড়তে ভুলে যায় তো এমন লোক আবার বিতর নামায পড়বে কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ কেউ যদি দোয়ায়ে কুনুৎ পড়তে ভুলে যায় তাহলে তার নামায হয়ে যাবে। এটা পড়া এমন কোন ফরয নয়।

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ খৃষ্টানেরা Christmas Tree কেন সাজায়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা রুসুম বা কুপ্রথা। কৃসমাস্ ট্রী-এর কোনই ধর্মীয় গুরুত্ব নেই। এটা বিলাসিতার উপকরণের অন্যতম।

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ এত ছোট মাকড়সা এত বড় সুন্দর জাল কীভাবে বানায়?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ এটা আল্লাহ্তাআলার শান ও মর্যাদা। মাকড়সার অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। এর মুখ থেকে এক প্রকার সূতা বের করে তা দিয়ে জাল বুনে। সুতার সাথে এরা ঝুলে থাকে। আর ধীরে ধীরে জাল বানাতে থাকে। Per unit volume হিসাব করলে দেখা যাবে যে, মাকড়সার জাল শক্তিতে ইস্পাতের তুলনায় বেশি শক্তিশালী।

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ কেয়ামতের পূর্বেও কি মহানবী (সঃ)-এর শাফাআত বা সুপারিশ মানুষের সাহায্য লাগতে পারে কিনা?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ হ্যাঁ। মহানবী (সঃ)-এর শাফায়াত অবশ্যই কাজ করতে পারে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শাফাআতে অনেক লোক লাভবান হয়েছিলেন। যেমন জটিল রোগ থেকে বহু রোগী ভাল হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ আরোগ্য লাভ করেছিল। তাই তাঁর প্রভু মহানবী (সঃ)-এর শাফাআত কেয়ামতের পূর্বে নিশ্চয় কাজে লাগবে।

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ দু'টি মুসলমান দেশের মাঝে যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায় তো একটা দেশ অন্য দেশের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিতে পারে কি?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ পানির সরবরাহ বন্ধ করা ঠিক হবে না।

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ নামায পড়তে পড়তে যদি নামাযী একেবারে ভুলে যায় যে, সে কোন্ রাকাআত পড়ছে তখন নামাযীর কি করা উচিত?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ যে রাকা'আত তার মনে পড়ে সে তা পড়ে নিক পরে সিজাদা সাহু করে নিবে।

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ মহানবী (সঃ) যখন নামায পড়তেন তখন তিনি নিজেও কি দুরূদ শরীফ পাঠ করতেন?

হুযূর (আইঃ) উত্তর দেন ঃ অবশ্যই। মহানবী (সঃ) নামায পড়ার সময় নিজেও দুরূদ শরীফ পাঠ করতেন।

(রেকর্ডিং ঠিক না হওয়ার কারণে শেষ প্রশ্নটি উপস্থাপন করা গেল না।

সংকলন ও অনুবাদ - নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী

ছোটদের পাতা

এস হাদীস শিখি

(৮ম কিস্তি)

(২৫) আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না করা

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ -

(লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা ক্বাত্বি'উন-বুখারী)

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন করীমের সূরা বাকারার ১৭৮ আয়াতে আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে আত্মীয়-স্বজনের জন্যে ধন-সম্পদ খরচ করার আদেশ দিয়েছেন। তেমনিভাবে সূরা রূমের ৩৯ আয়াতে আত্মীয়-স্বজনের অধিকার আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। অন্য এক হাদীসে নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে সে আমার দলের নয়। আর আলোচ্য হাদীসে তিনি (সঃ) বলে দিয়েছেন, যে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ দুনিয়ার জান্নাত তো হলো প্রথম ও মুখ্য বিষয়। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক না থাকলে তাদের অধিকার আদায় না করলে কারও পক্ষে শান্তিতে বসবাস করা সম্ভব হয় না। কেননা, সর্বদা তাকে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। তাই এ দুনিয়ার জান্নাত বা সুখে শান্তিতে বাস করতে হলে যেমন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ভাব রাখতে হবে তেমনি এর সুফল হিসেবে পরকালে জান্নাত লাভ হবে। কেননা, আত্মীয়-স্বজনের অধিকার খর্ব করার ব্যাপারে তাকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদেহী করতে হবে না এ ব্যাপারে আগেই কি সে মুক্ত হয়ে গেছে?

(২৬) অন্যের প্রতি কৃপা কর

مَنْ لَّا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ -

(মাল্লা ইয়ারহাম লা ইউরহাম-বুখারী)

অর্থ ঃ যে কৃপা করে না তাকে কৃপা করা হবে না।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্তাআলা রহমান (পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী) ও রহীম (বার বার কৃপাকারী) তাঁর কৃপা সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে (সূরা আনআম ঃ ১৪৮)। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ কৃপা করাকে তাঁর সত্তার জন্যে অবধারিত করে নিয়েছেন (সূরা আনআম ঃ ১৩)। আল্লাহ্তাআলা তাঁর ইবাদত ও উপাসনা করার জন্যেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (সূরা যারিরাত ঃ ৫৭)। আর এ কাজ একজন মানুষ তখনই সুষ্ঠুভাবে করতে সক্ষম হয় যখন সে আল্লাহ্র সিফ্ত বা গুণাবলী সম্বন্ধে জানতে পারে ও নিজের মাঝে সে গুণাবলী আত্মস্থ করতে পারে। তার প্রতিটি কাজ-কর্ম ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা সে গুণাবলীর আলোকে আলোকিত হয়। আল্লাহ্তাআলা সর্বতঃ কৃপাময় এবং তাঁর কৃপা সব কিছুকে ঘিরে

আছে। যদি কোন ব্যক্তি কৃপাগুলোর আলোকে আলোকিত না হয় তাহলে আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ গুণ থেকে সে বঞ্চিত থাকবে। সে ব্যক্তি সঠিকভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদতও করতে সক্ষম হবে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করার চেষ্টায় নিয়োজিত নয় সে কীভাবে আল্লাহ্‌র কৃপার অধিকারী হতে পারে? মানবের বিবেক-বুদ্ধিও এ কথায় সায় দেয় না, যে কৃপা করতে জানে না সে কীভাবে কৃপা লাভ করতে পারে? তাই নবী করীম (সঃ) আমাদেরকে কৃপা লাভের একটি রহস্য শিখিয়েছেন অর্থাৎ আমরা যেন অন্যের প্রতি কৃপা করি তবে আমাদের কৃপা লাভ হবে।

(২৭) সবার আগে সালাম দাও

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ- (ابو داؤد)

(ইন্না আওলান্নাসি বিল্লাহি মান বাদায়াহুম বিস্‌সালামি-বুখারী)

অর্থ ঃ নিশ্চয় সেসব মানুষ আল্লাহ্‌র প্রিয় যারা প্রথমে 'সালাম' দেয়।

ব্যাখ্যা ঃ একে অন্য সম্ভাষণ করার রীতি প্রত্যেক ধর্ম বা জাতিতে রয়েছে। কেউ বলে, গুড মর্নিং, কেউ বলে নমস্কার ইত্যাদি আর মুসলমানরা বলে- **আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু**। এর অর্থ তোমার ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি, কৃপা ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। মুসলমান প্রদত্ত সম্ভাষণ একটি দোয়া ও শুভ কামনা। এটা যে অন্যান্য সম্ভাষণ থেকে উত্তম ও ব্যাপক অর্থবহ তা বলাই বাহুল্য। এ হাদীসে হযরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ দোয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করতে বারণ করেছেন বরং বলেছেন যে-ব্যক্তি আগে সালাম দেয় সে আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়। নবী করীম (সঃ) অন্য এক হাদীসে **আফসুস্ সালাম** বলে সালামের ব্যাপক প্রচলনের তাগিদ দিয়েছেন (তিরমিযী)। বিশ্বে পরস্পরের জন্যে শুভ কামনা ও দোয়া যদি আন্তরিক ও ব্যাপক হয় তাহলে ব্যক্তি সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতির গন্ডি পেরিয়ে বিশ্ব সমাজেও শান্তির সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হতে পারে।

হাদীসে এসেছে, ভাল কথা বলাও একটি পুণ্য। আর সাক্ষাতের সময় একে অপরের মঙ্গল কামনা করে দোয়ার সম্ভাষণের চেয়ে উত্তম কথা আর কী হতে পারে? বিষয়টি ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

কুরআন করীমের সূরা বাকারার ১৪৯ আয়াতে বলা হয়েছে **ফাসতাবিকুল খয়রাত** অর্থ পুণ্য কাজে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা কর। অতএব একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানকে সালাম দেয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করলে আল্লাহ্‌তাআলার এ আদেশ পালনে তাঁর নিকটবর্তী লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হতে পারে।

আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে আমাদের জামাতের সালামের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। এমন অনেক বুযুর্গের কথা শুনা যায় তাঁদেরকে আগে সালাম দেয়া বড়ই কষ্টের ব্যাপার ছিলো। হযরত মসীহ্ মাওউদ-এর এক অন্ধ সাহাবীর কথা জানা যায়, পেছনে কারও পায়ের শব্দ পেলেও তিনি আগে ভাগে 'সালাম' দিয়ে দিতেন। কোন সময় একটি মইষই কেন না তাঁর পেছনে এসেছে আর তার পায়ের শব্দে সেটিকেও তিনি সালাম দিয়ে দিয়েছেন।

তিরমিযীর এক হাদীসে উল্লেখ এসেছে; নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ দু'ব্যক্তি সাক্ষাৎ করলে কার আগে সালাম দেয়া উচিত? তিনি জবাবে বলেছেন ঃ যে আল্লাহ্‌র সবচে' নিকটে। এ প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাবের অর্থ এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির চেষ্টা করা উচিত যেন প্রথমে সালাম দিয়ে আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে এ সূক্ষ্ম-তত্ত্ব উপলব্ধি করার এবং এতদনুযায়ী আমল করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

(২৮) ওপরের হাত উত্তম

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفْلٰى

(আল্ ইয়াদুল 'উলইয়া খয়রুম্মিনাল ইয়াদিস্ সুফলা-মুয়াত্তা, ইমাম মালিক)

অর্থ ঃ ওপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম।

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এক দিকে যেমন ধনীদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন কোন সাহায্যপ্রার্থীকে বিমুখ না করা হয়। এমন কি বলেছেন খেজুরের একটি টুকরো দিয়ে হলেও দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাও। অন্য দিকে তিনি অভাবীদেরকে হাত পাতা থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করেছেন একথা বলে যে, নীচের হাত নিকৃষ্ট। নবী করীম (সঃ)-এর এ মূল্যবান উপদেশ তাঁর (সঃ) সাহাবাগণকে আত্ম-সম্মান ও মর্যাদাবোধে এমনভাবে জাগ্রত করেছিলেন যে, তাঁরা (রাঃ) কখনও হাত পাততেন না। এমন কি দুঃখ-কষ্টের শিকার হলেও মুখ ফুটে কারও কাছে কিছু চাইতেন না। আসহাবে সুফ্‌ফা এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

একবার এক দরিদ্র লোককে দেখে তার ঘরে কী আছে জানতে চাইলেন হুযূর (সঃ)। দরিদ্র লোকটি তার ঘরের কম্বল খানা নিয়ে আসলেন। নবী করীম (সঃ) তার কম্বল খানা বিক্রী করে তাকে একখানা কুঠার ও সেই দিনের খাবার কিনে দিলেন আর বল্লেন, কুঠার দিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রী করবে, তবু হাত পাতবে না। কবি এ শিক্ষাকে যথার্থভাবে তার ছন্দে বেঁধে দিয়েছেন-

"নবীর শিক্ষা ক'র না ভিক্ষা মেহনত কর সবে"।

(২৯) উত্তম চরিত্রের তাৎপর্য

مَامِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيْزَانِ اَثْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ-

(মা মিন শায়্‌ইন ফিল মীযানি আছকালা মিন হুসনিল খুল্‌কি-আবূ দাউদ)

অর্থ ঃ উত্তম চরিত্র ছাড়া (আল্লাহ্‌র) পাল্লায় আর কোন জিনিষ ভারী নেই।

ব্যাখ্যা ঃ নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম নৈতিক চরিত্র সংশোধনের ব্যাপারে অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে তাঁর (সঃ) অনেক কথা পাওয়া যায়। আসলে উত্তম চরিত্র প্রত্যেক পুণ্যের ভিত্তি। এমনকি আধ্যাত্মিকতাও প্রকৃতপক্ষে উত্তম চরিত্রের একটি উন্নত মার্গ। উত্তম চরিত্রের জন্যে নবী আকরম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উত্তম আদর্শ আমাদের জন্যে পাথেয়। এমন কি আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং সূরা কলম-এর ৫ আয়াতে বলেছেন - **ওয়া ইন্নাকা লাআলা খুলুক্বিন 'আযীম** অর্থাৎ আর (হে মুহাম্মদ!) নিশ্চয় তুমি অতি মহান চরিত্রের ওপরে অধিষ্ঠিত।

যেহেতু নবী আকরম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম স্বয়ং উত্তম চরিত্রের এক পূর্ণ ও পরিপূর্ণ আদর্শে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাই তিনি অবশ্যই উত্তম চরিত্রের তাৎপর্যের উত্তম মাপকাঠি। আমাদের সর্বদা নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উত্তম চরিত্রের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসরমান থাকা আবশ্যক। (চলবে)

- মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

১১-এরপর ইনশাআল্লাহ্

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১১ জুন, ১৯৯৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল, লন্ডনে প্রদত্ত]

আল্লাহ্তাআলা সমগ্র বিশ্বের জামাতগুলোকে জুমুআর মাধ্যমে এক হাতে একত্র হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন।

খোদার অনুগ্রহে জামাতে আহমদীয়া বিজয় ও কল্যাণের বিস্ময়কর যুগে প্রবেশ লাভ করেছে।

এখন ফসলসমূহ চাষ করার চেয়ে ফসলসমূহ সামলানোর সময় এসে দাঁড়িয়েছে। কেননা, ফল পেকে গিয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ সমগ্র বিশ্ব এসব কল্যাণ প্রত্যক্ষ করবে।

বিশেষ করে দোয়া করুন যে, ১১-এর পরে একটি পর্যায় শুরু হতে যাচ্ছে একে আল্লাহ্তাআলা শেষ সীমা পর্যন্ত যেন কল্যাণ দিয়ে ভরতি করে দেন।

খোদাতাআলার যে অসাধারণ অনুগ্রহরাজী অবতীর্ণ হচ্ছে তা মানুষের অভ্যন্তরীণ আকাঙ্ক্ষাসমূহের সাথে একটি গভীর সম্পর্ক রাখে।

তাশাহ্হুদ, তাআ'উয, ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনওয়ার আইয়্যাদাহুল্লাহুতাআলা বেনাসরিহিল আযীয সূরা আল্ ফাত্হ্-এর নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝

তরজমা - মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল আর যারা তার সাথে আছে তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্র-চিত্ত। তুমি তাদেরকে রুকূ' ও সেজদারত দেখতে পাবে, তারা সর্বদা আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের জন্যে যত্নবান থাকে। সিজদার

চিহ্নের দরুন তাদের চেহারায় তাদের (পরিচয়ের) লক্ষণাবলী রয়েছে। তাদের এ বিবরণ তওরাতে আছে, এবং ইঞ্জীলেও আছে। তাদের এ বিবরণ, এক শস্য ক্ষেতের ন্যায়, যা নিজ অঙ্কুর নির্গত করে। এরপর একে সুদৃঢ় করে। এ আরও পরিপুষ্ট হয়। তারপর এ নিজের কাণ্ডের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয় যা কৃষককে আশ্চর্যান্বিত করে যেন তিনি তাদের (অর্থাৎ মু'মিনদের উন্নতি) দিয়ে কাফিরদিগকে ক্রোধান্বিত করেন।তাদের মাঝে যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদের সাথে ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের অঙ্গীকার করেছেন (সূরা ফাত্হ্ ঃ ৩০)।

এ বিষয়ের এক অংশের ওপরে আমি ইতোপূর্বেও আলোকপাত করেছি। কিন্তু এ বিষয়ে জুমুআয় আরও বলার ছিল আর এ পর্যায়ে আমি হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস্সালাম-এর কতিপয় উদ্ধৃতি এবং বাইবেল অর্থাৎ ইংরেজী নতুন নিয়ম থেকে হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর সেসব উদ্ধৃতিও পেশ করতে চেয়েছিলাম যেগুলোর সাথে এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়াবলীর সম্পর্ক রয়েছে।

জামাতের ক্রমোন্নতি একটি কৃষির অনুরূপ ঃ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "আমাদের জামাতের উন্নতিও হবে ধাপে ধাপে এবং 'কাযার'ইন' (অর্থাৎ কৃষির অনুরূপ) হবে। আর উদ্দেশ্যাবলীও হবে সেই বীজের ন্যায় যা ভূমিতে বপন করা হয়। সে মর্যাদা ও পরম উদ্দেশ্যাবলী যার ওপরে আল্লাহ্তাআলা একে অর্থাৎ (কৃষিকে) পৌছাতে চান ['কৃষি' শব্দটি আমি ব্যাপকতার জন্যে ব্যবহার করেছি] হযরত আকদস (আঃ)-এর ভাষায় সে মর্যাদা ও পরম উদ্দেশ্যাবলী যে পর্যন্ত আল্লাহ্তাআলা একে পৌছাতে চান এখনও অনেক দূরে। খোদাতাআলা যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এ জামাতকে প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই বৈশিষ্ট্যাবলী সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তা লাভ হতে পারে না। তৌহীদ (একত্ববাদে)-এর স্বীকারোক্তির মাঝেও বিশেষ ধরন সৃষ্টি হোক। এক বিশেষ ধরনের তাবাত্তল ইলাল্লাহ্ (অর্থাৎ দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে আল্লাহ্র দিকে ঝোঁকা) হোক। যিক্রে এলাহী (আল্লাহ্র স্মরণ)-তেও এক বিশেষ ধরনের সৃষ্টি হোক। একটি বিশেষ ধরন এর মাঝে সৃষ্টি হোক (আল্ হাকাম ঃ ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৯ সংখ্যা, ৫ পৃষ্ঠা, ১৭ আগষ্ট, ১৯০২ খৃষ্টাব্দ)।

হযরত আকদস মসীহে, মাওউদ (আঃ) এ চারটি শিরোনাম নির্ধারিত করেছেন। এর সম্পর্ক মসীহী গুণাবলীর সাথেও রয়েছে। আর হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সে সর্বোত্তম গুণাবলীর সাথেও সম্পর্কযুক্ত যেগুলো সম্বন্ধে আলোচ্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এ গুণাবলী যা মসীহের সাথে সম্পর্ক রাখে যখন হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সত্তায় ও সেসব লোকের মাঝে বিকশিত হয় যারা 'মা'আহু' (অর্থাৎ তাঁর সাথে)-এর অধীন হয় অর্থাৎ তাঁর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন এক নতুন আঙ্গিকে এ বিকাশে বিস্ময়কর চমক ও চিরস্থায়ী আলো সৃষ্টি হয়ে যায়। এ রকম মনে হয় যেন একেবারে একটি নতুন দীপ্তি প্রকাশিত হয়ছে; যদিও গুণ তা-ই রয়েছে বা প্রথমেও প্রকাশিত হয়েছিল। এতদ্সংশ্লিষ্ট সূত্রে কুরআন করীমও এসব কথা উল্লেখ করেছে। মসীহ্ (আঃ) যেসব কথার উল্লেখ করেছেন আর যেখানে উল্লেখ করেছেন সেখানে এক বিস্ময়কর অগ্রসরমান দীপ্তিসমূহেরও উল্লেখ করে দিয়েছেন। এজন্যে এটা কোন কাল্পনিক

কথা নয়। কেবল সেই সত্তার প্রশংসায় এরূপ একজন মানুষের কথা নয় যার সাথে ভালবাসা রয়েছে, বরং আল্লাহ্‌তাআলা প্রকৃতই সে রঙ্গে এ বিষয়কে কুরআন করীমে উল্লেখ করেছেন। যেখানে যেখানে মসীহ্ (আঃ) এ গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন। এর মোকাবেলায় কুরআন করীমও ওসবের উল্লেখ করেছে। আর তুলনা করে বিস্তারিতভাবে অবহিত হওয়া যায় যে, সর্বৈব এক নতুন মর্যাদার সাথে এসব গুণের উল্লেখ করা হয়েছে এবং নতুন বিষয়কে আত্মস্থ করে সেগুলোকে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও এ বিষয়টি এমনই যে, এর সাথে জামাতে আহমদীয়ার গভীর সম্পর্ক রয়েছে এবং এ উদ্দেশ্য রয়েছে যে, যার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, এখনও সে পর্যন্ত পৌছা অনেক দূরের কথা। যদিও হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগের যে সাহাবগণের জামাত সৃষ্টি হয়েছিল তাদের মাধ্যমে সবচে' অধিক মর্যাদার সাথে এ উদ্দেশ্যাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। তাহলে তিনি কেন এ কথা বলেছেন যে, সে পর্যন্ত পৌছা এখনও অনেক দূরের কথা! প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য এই যে, চেষ্টা-প্রচেষ্টার সে দীর্ঘ যুগ যার মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে আহমদীয়তকে সেসব উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক রূপ প্রদান করা এবং একটি বিশ্বজনীন জামাত হিসেবে দুনিয়াতে ছড়িয়ে এসব উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে গিয়ে সারা দুনিয়ায় এ পরম গুণাবলী ছড়িয়ে দেবার ছিল। এজন্যে যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন, সেসব উদ্দেশ্যে বা সে পর্যন্ত পৌছা এখনও অনেক দূরের কথা- তখন এর উদ্দেশ্য অবশ্যই এটা নয় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে তো তরবিয়তে দুর্বলতা ছিল আর এখন সে পরম উদ্দেশ্যাবলীকে জামাত লাভ করে নি বরং পরে অন্য কোন যুগে তা লাভ হবে। এ রকম চিন্তা যে করবে সে বোকামী করবে। কেননা, হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর যুগের প্রসঙ্গেই কুরআন করীমে এ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, **ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহীম**। আর এ কল্যাণ আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ থেকেই লাভ করেছি। 'আখারীন' গুণটি বংশপরম্পরায় প্রবাহমান হয়ে চলেছে। অতএব নিজেদের এ বিনীত মর্যাদাকে খুব ভালভাবে দৃষ্টিপটে রেখে এখন এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিন যা আমি আপনাদের সামনে রাখতে চাই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে চারটি গুণ বর্ণনা করেছেন, তা এরূপই যে, এর মাঝ থেকে প্রতিটি গুণ নিজস্ব অস্তিত্বে একটি পৃথক খুতবার প্রত্যাশা রাখে আর এর এক শব্দে বড়ই ব্যাপক বিষয়-বস্তু বর্ণনা করা হয়েছে। পুনরায় এদের মাঝে আপোষে একটি তরবিয়তি সম্পর্কও আছে। যে কথা প্রথমে বলা হয়েছে তা প্রথমেই বলা উচিত ছিল। যে কথা দ্বিতীয় স্তরের তা দ্বিতীয় স্তরেই বলা উচিত ছিল। আর এভাবে ধারাবাহিকতার একটি অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক জারী আছে। এ বিষয়ে ইনশাআল্লাহ্ ধারাবাহিক খুতবার মাঝে বর্ণনা করা না গেলেও আগামীতে কোন এক সময়ে খোদাতাআলা সৌভাগ্য দিলে বর্ণনা করবো। কেননা, কখনও কখনও অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ অপারগ করে দেয় যে, ধারাবাহিকতাকে ভঙ্গ করে অপর একটি বিষয় শুরু করতে হয়; কিন্তু এসব বিষয় আমার মনে থাকে। আগামীতে যখনই সুযোগ লাভ হয় তখন ইনশাআল্লাহ্ একে ধারাবাহিকভাবে সম্মুখে নিয়ে আসতে থাকবো।

অতীত কিতাবসমূহে জামাত-এর উল্লেখ এবং আমাদের দায়িত্বাবলী ঃ

এখন আমি কেবল এটা বলতে চাই যে, এ বিষয়-বস্তু পর্যন্ত পৌছার পূর্বে আমাদেরকে এসব উদ্ধৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার, যার মাঝে আমাদের বৈশিষ্ট্যাবলী ঐতিহাসিক দিক থেকে ঐশী কিতাবাদিতে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা কী? আমাদের দ্বারা কী প্রত্যাশা করা হচ্ছে? কোন্ উদ্দেশ্যে এ ক্ষেত-খামার এর ধারা আরম্ভ হয়েছে যার বর্ণনা মসীহ্ (আঃ) করেছেন। আর কুরআন করীম বলেছে- **ওয়া মাসালুহুম ফিল ইন্‌জীলে কাযার'ইন আখরজা শাত্বয়াহূ**- এসব লোকের দৃষ্টান্ত ইঞ্জীলে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, **কাযার'ইন আখরজা শাত্বয়াহূ**- এরূপ ক্ষেত - খামারের ন্যায় যার পাতা অঙ্কুরিত হয়েছে আর কৃষক জানে যে, প্রাথমিক কালের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কচি পাতা হিসেবে অঙ্কুরিত হয় **আখরজা শাত্বয়াহূ ফা আযারাহূ**- পরে এটাকে সুদৃঢ় করে দেয়, **ফাসতাগলাযা**- ফলে তা এরপরও পুষ্ট হয়ে আরও শক্তিশালী হয়, **ফাসতাওয়া 'আলা সুকিহী'**- পুনরায় তা নিজের কান্ডের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ সে ক্ষেতের দৃষ্টান্ত যার মাঝে কৃষক বীজ বপন করে, পুনরায় এভাবে ক্ষেতের বৃদ্ধি দেখে আর তার চোখের সামনে বাড়তে, ফুলে ফলে সুশোভিত হতে দেখে এবং সুদৃঢ় অবস্থায় দেখে; কিন্তু এর ফল এভাবে প্রকাশিত হয় যে, **ইউ'জিবুয্‌যুর্‌রা'আ লি ইয়াগীযা বিহিমুল কুফ্‌ফার**-কৃষক খুবই চমৎকৃত হয় কিন্তু যারা অস্বীকারকারী তারা এদের এ কল্যাণ দেখতে দেখতে চলতে থাকে আর তারা খুব বেশি ক্রোধান্বিত হয়।

সাধারণভাবে লোকেরা এটা মনে করে যে, এখানে 'কৃষক' বলতে খোদার হাতকে বুঝাচ্ছে যা বপন করেছে। এ ক্ষেত খোদার হাত দ্বারাই বপন করা হয়ে থাকে, কিন্তু এখানে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাতে খোদার হাত সম্পর্কে সরাসরি উল্লেখ করা হয় নি বরং **যুর্‌রা'আ** বলা হয়েছে অর্থাৎ অনেক বেশি বপনকারী- যে অনেক বপন করে। প্রকৃতপক্ষে এখানে দায়ী ইলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী একটি জামাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা বেশি বেশি করে বিভিন্ন জমিতে বীজ ছড়িয়ে চলে যায়। আর সে বীজ যখন উত্তম জমিতে পতিত হয় তখন যে অবস্থার মাঝ দিয়ে যে জাঁকজমকের সাথে তা বেড়ে যায় ও ক্রমবিকাশ লাভ করে এর সম্বন্ধে এখানে বলা হয়েছে। যখন **'যুর্‌রা'আ'**-এর বিষয়-বস্তুকে আপনি দৃষ্টির সম্মুখে রাখবেন তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যে দৃষ্টান্তগুলো বর্ণনা করেছেন ওগুলোকে বুঝা তুলনামূলকভাবে সহজতর হবে। এক হাতের ছড়ানো বীজ কোন বিশেষ ক্ষেতে পড়ে এবং উদ্‌গত হয়। সে হাত যদি কোন বিশেষজ্ঞের হয়, এরূপ ব্যক্তির হাত হয়, যে এ বিষয়-বস্তুকে বুঝে তাহলে সে ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয় যে, সে বীজকে খারাপ জমিগুলোতে নিক্ষেপ করে, তার জন্যে এটা সম্ভবই নয় যে, এ বীজকে সে ঝাড়-জঙ্গলে নিক্ষেপ করে বা কলঙ্কময় ভূমিতে নিক্ষেপ করে। এজন্যে এখানে 'খোদার হাত' বলে বর্ণনা করা হয় নি। এ মাহাত্ম্যই এখানে দৃষ্টিপটে রাখা দরকার। মু'মিনদের মাঝে কেউ কেউ আছেন সাদা-সিদে, কেউ কেউ আছেন ধীশক্তি সম্পন্ন, কেউ কেউ আছেন অভিজ্ঞ আবার কেউ কেউ অনভিজ্ঞ। তবলীগের ক্ষেত্রে প্রতিদিন তাদের সাথে বিভিন্ন লোকের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় আর কেউ কেউ এরূপ আছেন যারা অনুর্বর ভূমির সাথেই সারা জীবন সংগ্রাম করে কাটিয়ে দেন। বীজ নিক্ষেপ করে তো অনুর্বর ভূমিতে। কখনও একটু আধটু বীজ ফোটেও; কিন্তু শুকিয়ে যায়। এভাবে কেউ কেউ এমন

আছেন যারা এমন স্থানে বীজ নিক্ষেপ করেন যেখানে আশে-পাশে রক্তপিপাসু জন্তু জানোয়ার আছে। মোল্লারূপ শত্রু মজুদ আছে। সে উদগ্রীব থাকে যে, বীজ বপনকারী এদিকে পিঠ ফেরালেই সে এসে ক্ষেতকে ধ্বংস করে দেবে। এরূপ লোকও আছে আর প্রকৃতই এরূপ হয়েও থাকে। কোন কোন এরূপ বুদ্ধিমান বীজ বপনকারীও আছেন যারা উর্বর জমিকে নির্বাচন করেন। এর পরে সংরক্ষণ করেন এবং তত্ত্বাবধান করেন। তাদের ক্ষেতে যে ক্রমবিকাশ দেখা যায় এবং কুরআন করীম শেষ পর্যায়ে যে দৃষ্টান্ত দিয়েছে তা এরূপ লোকের সম্বন্ধেই দিয়েছে। হযরত মসীহ্ (আঃ) বিস্তারিতভাবে এসব লোকের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কেউ এখানে বীজ নিক্ষেপ করলো কেউ সেখানে বীজ নিক্ষেপ করলো। কারও বীজ অনুর্বর জমিতে নষ্ট হয়ে গেল। কারও বীজ জানোয়ার গিলে ফেল্ল। কিন্তু কুরআন করীম বিস্তারিতভাবে সে দৃষ্টান্তকে বর্ণনা না করে এসব লোকের দৃষ্টান্ত দিয়েছে যারা প্রজ্ঞার সাথে উত্তম জমিতে বীজ নিক্ষেপ করে আর এ মর্যাদা মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সঃ)-এর, যাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে- **ওল্লাযীনা মা'আহূ**- প্রজ্ঞাবান লোক আছে, বোধসম্পন্ন লোকও আছে। তারা নিজের বীজকে নষ্ট করেন না। আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে যোগ্যতা দান করেছেন যে, তারা উত্তম জমি নির্বাচন করেন এবং পুনরায় সে বীজকে সংরক্ষণ করেন। একে নিজের চোখের সামনে অঙ্কুরিত হতে দেখেন, বিকশিত হতে দেখেন। এর শ্যামলতা তার চোখকে বিমোহিত করে আর শত্রু এতদ্দ্বারা ক্রোধান্বিত হয়; কিন্তু কিছুই করতে পারে না। এজন্যে আমি যখন মসীহ্ (আঃ)-এর দৃষ্টান্তের সাথে কুরআন করীমের দৃষ্টান্তসমূহকে যাচাই করি তখন অবিকল স্পষ্টভাবে নির্ধারিত কথা এই দাঁড়ায়, কুরআন করীম এ বিষয়-বস্তুকে প্রসারতা দিয়েছে আর এ বিষয়-বস্তুতে এক অসাধারণ মাহাত্ম্য সৃষ্টি করে দিয়েছে।

তবলীগের একটি গভীর চিহ্ন ঃ

এখন আমি মসীহ্ (আঃ)-এর সে বর্ণনাকে নিচ্ছি যার মোকাবেলায় কোন কোন আরও আয়াতও আপনাদের সামনে রাখবো যার মাঝে এ বিষয়টি আরও একটি মর্যাদার সাথে কুরআন করীম বর্ণনা করেছে; যদিও মসীহ্ (আঃ)-এর সম্পর্ক আখেরী যুগের সাথে। কুরআন করীম থেকে প্রমাণিত হয় এবং আহাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, হযরত আকদস মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সঃ)-এর আখেরী যুগে তাঁর যে গোলামের আবির্ভাবের কথা আছে তাঁকে মসীহ্ (আঃ)-এর মাহাত্ম্য দান করা হবে তার নাম মসীহ্ রাখা হয়েছে। এজন্যে সেসব প্রতীকের সাথে আমাদের সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন, আর সে প্রতীকসমূহ আমাদেরকে সতর্ক ও জাগ্রত করে যে, দেখো! তোমরা প্রথম মসীহ্ (আঃ)-এর যুগ পর্যন্ত গিয়ে থেমে যেয়ো না। তোমাদের দৃষ্টান্ত তাথেকে মিলে, কিন্তু তোমাদের মর্যাদা তাথেকে বেড়ে যাওয়া উচিত। কেননা, তোমরা মুসায়ী মসীহ্-এর দাস নও, মুহাম্মদী মসীহ্-এর দাস। অতএব দৃষ্টি রাখো যে, মসীহ্ (আঃ) কী কী দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। এর মাঝে যা উৎকৃষ্টতর পাও তা তোমাদের জন্যে বেছে নাও। কুরআন করীম মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণনা করেছে যে, যখন তাদের সামনে বিষয়াদি বর্ণনা করা হয় তখন তারা উত্তমগুলোকে অবলম্বন করে নেয় যার অর্থ এই যে, বিভিন্ন প্রকারের দৃষ্টান্ত হতে পারে; কিন্তু তুলনামূলকভাবে সামান্য, কিছু তাথেকে উৎকৃষ্টতর, কিছু এথেকে অধিক ভাল আর কোন কোনটি সর্বোত্তম। সবচে' উত্তম তো হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দাসগণ থেকে আশা করা হয়েছে যে, তোমরা সর্বপ্রকার দৃষ্টান্তের কথা শুনবে কিন্তু সর্বোত্তমকে বেছে নেমে। কেননা, তোমাদের নেতা সর্বোত্তম; যাঁর দাস হতে তোমরা গর্ববোধ কর সেই নবী সব নবীর চেয়ে উত্তম। সমগ্র সৃষ্টির মাঝে কোন সত্তা তাঁর সমমর্যাদায় সৃষ্টি হয় নি। অতএব তাঁর তুলনায় তোমরা নিজেদের মাঝে সেরকমই উৎকর্ষ সৃষ্টির চেষ্টা করো। সে আয়াতের সাথে সম্পর্কিত হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর দৃষ্টান্তসমূহ এখন শুনো। তিনি (আঃ) বলেন সেই দিনই যিশু ঘর থেকে বের হয়ে ঝিলের কিনারায় গিয়ে বসলেন। আর তাঁর নিকটে এরূপ বিরাট ভীড় জমা হয়ে গেল যে, তিনি এক নৌকায় গিয়ে বসলেন এবং সব লোক কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকলো আর তিনি তাদের সাথে অনেক কথাই দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন যে, দেখ! একজন বপনকারী বীজ বপন করার জন্যে বের হলো এবং বপন করার সময়ে কতক দানা পথের কিনারায় পড়ে গেল এবং পাখীরা এসে ওগুলোকে গিলে ফেল্লো। (অর্থাৎ একজন মুবাল্লেগ এমনও যার দৃষ্টান্ত এরূপ) ... কিছু কঙ্করময় জমিতে পড়লো যেখানে ওগুলো প্রয়োজনীয় মাটি পেল না, আর গভীর মাটি না পাওয়ার কারণে শীঘ্র অঙ্কুরিত হলো। এবং যখন সূর্য উঠলো তখন পুড়ে গেলো আর শিকড় না হওয়ার কারণে শুকিয়ে গেলো, এবং কোন কোন বীজ ঝাড়-জঙ্গলে পড়লো এবং জঙ্গল বৃদ্ধি পেয়ে ওগুলোকে চেপে ধরলো, এবং কিছু উৎকৃষ্ট জমিতে পড়লো ও ফল দিতে লাগলো- কিছু শতগুণ, কিছু ষাট গুণ, কিছু ত্রিশ গুণ। যার কান আছে সে শুনে নিক। শিষ্যেরা নিকটে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি দৃষ্টান্তের দ্বারা কেন কথা বলছো? তিনি জবাব দিলেন, স্বর্গ রাজের নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ তোমাদেরকে জানতে দেয়া হচ্ছে, কিন্তু তাদের দেয়া হয় নি। কেননা, যার নিকট আছে তাকে দেয়া হবে আর তার অধিক হয়ে যাবে এবং যার নিকট নেই তার যা আছে তা-ও নিয়ে নেয়া হবে। আমি এজন্যে তাদেরকে দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা বলছি যে, তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না, এবং বুঝেও বুঝে না। আর তাদের সম্বন্ধে যিশাইয়-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হচ্ছে- তোমরা কান দ্বারা শুনবে কিন্তু কখনও বুঝবে না ... (মথি-১৩ ঃ ১-১৪- অনুবাদক)।

এসব দৃষ্টান্তের দ্বিতীয় অংশ পরে বর্ণনা করা হবে। প্রথম অংশ প্রসঙ্গে কুরআন করীমের দু'টি আয়াত যা মনে ভেসে আসে তা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি ঃ

ফা মাসালুহূ কামাসালি সাফওয়ানিন 'আলায়হে তুরাবুন ফা আসাবাহূ ওয়াবিলুন ফা তারাকাহূ সালদান (তার দৃষ্টান্ত সে মসৃণ-শক্ত পাথরের অবস্থার ন্যায় যার ওপরে অল্প মাটি পড়ে আছে, অতঃপর এর ওপরে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে একে পরিষ্কার শক্ত পাথর রূপেই রেখে যায় (সূরা বাকারা ঃ ২৬৫ - অনুবাদক)।

অর্থাৎ সে বীজের দৃষ্টান্ত অর্থাৎ কাজের দৃষ্টান্ত যা লোক দেখানো ভাব নিয়ে করা হয়, যা কেবল মাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরে করা হয় না, এর মাঝে লোক দেখানো অংশ মিশ্রিত থাকে। এর দৃষ্টান্ত এরূপ যে, তা পাথরময় মাঠের ওপরে পতিত বীজের ন্যায় যার ওপরে সামান্য মাটি থাকে **ফা আসাবাহূ ওয়াজিলুন**- পুনরায় যখন প্রবল বৃষ্টি এর ওপরে পতিত হয়- **ফাতারাকাহূ সালদান**- সে মাটিকে ধুয়ে নেয় এবং মাঠকে কঙ্করময় হিসেবে ছেড়ে যায়। এ

ঐশী কথার মাঝে এক বিরাট প্রজ্ঞা এই যে, সেসব লোক যাদের বীজ নষ্ট হয়ে যায় তাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাসমূহকেও চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। নচেৎ একনিষ্ঠ মু'মিন ও একনিষ্ঠ মুত্তাকীগণের বীজ নষ্ট হয়ে যায় না। বলা হয়েছে কিছু বীজ অবশ্যই কঙ্করময় স্থানেও পতিত হয় কিন্তু মু'মিন কঙ্করময় স্থানে বীজ বপন করে না। কেননা, মু'মিন কেবল দেখানোর জন্যে বা নিজ মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে কাজ করে না। তারা এ কথা বলে বেড়ায় না যে, হ্যাঁ, আমি এত সময় তবলীগ করেছি, এত লোকের নিকট বাণী পৌঁছে দিয়েছি। এসব কথা দ্বারা রিপোর্ট পরিপূর্ণ থাকে আর তাতে ফল কী দাঁড়ায়? তারপরে এমন হলো যে, লোকেরা চলে গেলো, তার পরে এতদ্দ্বারা কোন লাভই হোল না। এরপরে এ দুর্ঘটনা ঘটে গেল। কুরআন মজীদ তো মসীহ্ সম্বন্ধীয় দৃষ্টান্তের বর্ণনা দিয়েছে; কিন্তু দেখুন এটা কীরূপ মাহাত্ম্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। এক ডাক্তার যে রুগীর মানসিক অবস্থা বুঝে, তার মত রোগ নির্ণয় করে দিয়েছে। আল্লাহ্তাআলা বলে দিয়েছেন- "যদি তোমরা বীজ বপন করো আর প্রত্যেক বার তোমাদের বীজ নষ্ট হয়ে যায় এবং যখন বৃষ্টিপাত হয় তখন নিকটে আসার পরিবর্তে তা দূরে সরে যায়"-এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমবিকাশ লাভ করে তোমাদের ক্ষেতের রূপ ধারণ করার বদলে তা তোমাদের হাত থেকে সরে যেতে থাকে, তখন ধরে নাও যে, তোমাদের মাঝে কোন ত্রুটি ছিলো আর প্রকৃতই মসীহ্ (আঃ) যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাতো প্রতি দিনেই ঘটনার একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। রৌদ্র উঠলো আর বীজ নষ্ট হয়ে গেলো। বর্ষার সাথে বীজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্পর্ক- এটা একটি অতি অসাধারণ বিষয়বস্তু- এবং নতুন মাহাত্ম্যের বিষয়-বস্তু। একে কুরআন করীম বর্ণনা করেছে। প্রকৃত কথা এই যে, যখন ঐশী জ্যোতির্বিকাশ তেজদীপ্ত হয় যখন খোদাতাআলার দীপ্তি অধিক পরিমাণে অবতীর্ণ হয় এবং জামাতের উন্নতি সাধিত হয় তখন যাদের মাঝে দুর্বল সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে থাকে এরূপ লোকেরা সাথে সাথে চলতে পারে না তারা সেসব চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এমতাবস্থায় তাদের নিকট যা আশা করা হয়েছিল তারা তা পুরো করতে পারে না। তখন তাদের মৃত্যু অধিকতর ঐশী দীপ্তি প্রকাশের নিদর্শন হয়। কিন্তু কঙ্করময় মাঠে বীজ বপন করা এবং প্রতিদিন রৌদ্রের তেজে একে পুড়িয়ে দেয়া- এটা নিত্য দিনের এমন একটি বিষয় মানবীয় গুণাবলীর সাথে যার কোন গভীর সম্পর্ক নেই। কিন্তু কুরআন করীম যে বিষয়-বস্তু বর্ণনা করেছে ঈমান ও আমলের সাথে এর প্রতিদিন যে ঘটনাসমূহ প্রকাশিত হয় তার সাথে এক অতি গভীর এবং প্রকৃত সম্পর্ক রয়েছে। অতএব যে লোক বলে যে, আমরা তবলীগ করেছি ও বীজ ছড়িয়ে দিয়েছি এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন হয়েছে যে, সে জমিটি কঙ্করময়-অনুর্বর, কুরআন করীমের দৃষ্টান্ত তাদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। আর বুঝা উচিত যে, কঙ্করময়-অনুর্বর ভূমিতে তোমরা কেন বীজ বুনেছিলে এবং এটা বলা ঠিক নয় যে, সারাটা ভূমিই কঙ্করময়-অনুর্বর বরং কুরআন করীম তো বলে যে, কঙ্করময়-অনুর্বর ভুমি হওয়া সত্ত্বেও এতে সম্ভবনা মজুদ রয়েছে যে, পাথর-কঠিন অন্তর ফেটে প্রস্রবণ ফুটে বের হতে পারে। অতএব যদি তোমরা দোয়ার সাথে এবং আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে কাজ করো তাহলে তোমাদের দ্বারা যে ভুল-ত্রুটি হবে সেগুলো পুণ্য ফল দিবে। অতএব তবলীগের অতি গভীর বিষয়াদি বুঝান হয়েছে আর নিজের আত্ম-বিশ্লেষণের এক পদ্ধতি আমাদেরকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্তাআলা আহমদী জামাতকে এ থেকেও উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন।

আল্লাহ্তাআলা পক্ষে থেকে সে বীজে বরকত দানের প্রতিশ্রুতি ঃ

পুনরায় বিকশিত হয়েছে এমন বীজের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মসীহ্ (আঃ) আর আল্লাহ্তাআলা তা বরকতমন্ডিত করার যে প্রতিশ্রুতি মসীহ্ (আঃ)-এর সাথে করেছিলেন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করে এর মোকাবেলায় কিছু কিছু প্রতিশ্রুতি হযরত আকদস মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাথেও করা হয়েছে এবং এদের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধেও উল্লেখ করা হয়েছে। এখন দেখুন এ দুটোর মাঝে কত পার্থক্য!

মসীহ্ (আঃ) বলেন -

"কিছু উত্তম জমিতে পড়লো এবং ফল দিলো- কিছু একশ' গুণ, কিছু ষাট গুণ, কিছু ত্রিশ গুণ, যার কান আছে সে শুনে নিক"।

এক্ষেত্রে কুরআন করীম বলে -

মাসালুল্লাযীনা ইউনফিকূনা আমওয়ালাহুম ফী সাবিলিল্লাহি কামাসালি হাব্বাতিন আমবাতাত সাব'আ সানাবিলা ফী কুল্লি সুমবুলাতিম্মিয়াতু হাব্বাতিন ওয়াল্লাহু ইউযায়িফু লিমাইয়্যাশা'উ ওয়াল্লাহু ওয়াসি'উন আলীম (অর্থ - যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে তাদের দৃষ্টান্ত এক শস্য বীজের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে ও প্রত্যেকটি শীষে একশ' শস্য বীজ থাকে। আর আল্লাহ্ যার জন্যে চান এর চেয়েও বৃদ্ধি করে দেন; প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী! [সূরা বাকারা ঃ ২৬২]

অর্থাৎ হে মুহাম্মদ মুস্তাফার দাসগণ! তোমাদের জন্যে সুসংবাদ! তোমাদের দৃষ্টান্ত মসীহের বীজ বপনের দৃষ্টান্তের ন্যায় নয় যা অধিক থেকে অধিক শ'গুণ ফল দান করে। এথেকে নীচে নেমে ষাট গুণ অথবা এথেকেও কম। কুরআন বলেছে- মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সঃ)-এর দাস হও আর মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর কল্যাণে তোমাদের সাথে প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, ... হাব্বাতিন আমবাতাত সাব'আ সানাবিলা- সম্বলিত দৃষ্টান্ত এরূপ বীজের মত হবে যাথেকে সাতটি শীষ বের হয়েছে। সুনবাল বলতে শীষ বুঝায়। **ফী কুল্লি সুমবুলাতিম্মিয়াতু হাব্বাতিন-** আর প্রত্যেকটি শীষে একশ' দানা জন্মে। বলা হয়েছে যে, অধিক থেকে অধিক একশ' 'বরং আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদের সাথে আমাদের প্রতিশ্রুতি আছে যে, যদি তোমরা এরূপ স্থানে বীজ বপন করো যা উর্বর হয় আর খোদা-ভীতির সাথে বপন করো তাহলে স্বয়ং তোমাদের দৃষ্টান্ত বীজের ন্যায় হয়ে যাবে যা ক্রমবিকাশ লাভ করে এরূপ ক্রমবিকাশ লাভ করবে যে, এর মধ্যে এক একটি শস্যদানায় সাত সাতটি শীষ বের হয় আর প্রতিটি শীষে একশ' করে শস্য দানা জন্মে অর্থাৎ সাতশ' গুণ অধিক ফলন হয়; কিন্তু এটাও তো একটি সীমাবদ্ধ প্রতিশ্রুতি এবং আঁ হযরত (সঃ) তো উন্নতির সকল সীমাকে ডিঙ্গিয়ে দিয়েছেন। অতএব খোদাতাআলা বলেন যে- **ওয়াল্লাহু ইউযায়িফু লিমাইয়্যাশা'উ-** এটা বুঝা উচিত নয় যে, সাতশ' গুণ পর্যন্তই কথা শেষ হয়ে যাবে।' যদি তোমরা তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করো তাহলো এ সেই রসূল (সঃ) যিনি তোমাদেরকে

সীমাহীন উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। বাকী যারা আরও এসে যাবে তাদের জন্যও কোন সীমাবদ্ধতা নেই। **ওয়াল্লাহু ইউযা'য়িফু লিমাইয়্যাশা'উ**- তারা যতটা চায় সামনে এগিয়ে যাবে। যার জন্যে চাইবে আরও অধিক আগে এগিয়ে থাকবে। **ওয়াল্লাহু ওয়াসিউন 'আলীম**- আল্লাহ্তাআলা বহু ব্যাপকতা দানকারী ও সর্বজ্ঞ। সর্বজ্ঞ সত্তার সম্পর্ক মানুষের অভ্যন্তরস্থ অবস্থার সাথে আর খোদাতাআলার আশিস যা অসাধারণভাবে অবতীর্ণ হয় তা মানুষের অভ্যন্তরস্থ আকাশসমূহের সাথে এক গভীর সম্পর্ক রাখে। খোদাতাআলার রাস্তায় যদি অসাধারণ কুরবানী পেশ করার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় এবং মানুষ সর্বদা এ খেয়ালের বশে নিজেকে হারিয়ে ফেলে যে, আমি আরও কিছু করবো, কিছু আরো করবো; কিন্তু মানুষের সৌভাগ্য সীমিত হওয়া যদি সেসব আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করতে পারে তাহলে এরপরে পুনরায় ঐশী আশীষের সাথে এ বিষয়-বস্তুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যায়। পরে সে যতই অর্জন করে তাথেকে অধিক তাকে আল্লাহ্তাআলা দিয়ে দেন যেভাবে পাপের ব্যাপারে পাপীরা বলে থাকে-

না করদাহ্ গুনাহোঁ কী ভী হাসরাত কী মেলে দাদ

অর্থাৎ যে পাপ আমরা করতে পারি নি এর আফসোসের প্রতিদান দিয়ে দাও। যেন খোদাতাআলা সেসব পুণ্যের প্রতিদান দিয়ে দেন যা মানুষ করতে পারে না এবং অন্তরের সাথে এর সম্পর্ক আছে। তাই আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি তো ব্যাপাক কিন্তু সর্বজ্ঞ বটেন। যদি তোমাদের অন্তরের মাঝে অসীম সেবার আকাঙ্ক্ষা থাকে আর করার সৌভাগ্য লাভ না হয় তাহলে খোদা, যাঁর তোমরা দাস তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করছেন যে, তাঁর কল্যাণে, তাঁর ভালবাসার ফলে, আল্লাহ্তাআলা তোমাদেরকে সীমাহীনভাবে প্রতিদান দিবেন। তোমাদের সাথে শ' বা দুশ' অথবা চার শ' বা সাতশ' শস্য দানার অঙ্গীকার হবে না বরং সীমাহীন উন্নতি লাভ করবে।

নবী এবং ন্যায়নিষ্ঠগণের আকাঙ্ক্ষা ঃ

এর পরে যিশাইয়-এর ভবিষ্যদ্বাণী আরম্ভ হয়। হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, আজ আমরা যে পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলছি এটা সে পর্যায় যার ওপরে যিশাইয়-এর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। আর সে ভবিষ্যদ্বাণী কী ছিল?

"তোমরা শুনিতে থাকিও কিন্তু বুঝিও না, আর দেখিতে থাকিও কিন্তু জানিও না তুমি এই জাতির অন্তঃকরণ স্থূল কর, ইহাদের কর্ণ ভারী কর ও ইহাদের চক্ষু বন্ধ করিয়া দাও পাছে তাহারা চক্ষে দেখে, কর্ণ শুনে, অন্তঃকরণে বুঝে এবং ফিরিয়া আইসে ও সুস্থ হয়" (যিশাইয়-৬ঃ৯-১০-অনুবাদক)।

অর্থাৎ সতর্ক করছেন যেন আমাদের দ্বারা এটা না হয়। এ বিষয়-বস্তুকে কুরআন করীম এভাবে বর্ণনা করেছে -

"খাতামাল্লাহু 'আলা কুলূবিহিম ওয়া 'আলা সাম'ইহিম ওয়া 'আলা আবসরিহিম গিশাওয়াতুন" (সূরা বাকারা ঃ ৮)।

অর্থাৎ আল্লাহ্তাআলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। **ওয়া 'আলা সাম'ইহিম**-এবং তাদের কানে মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন। **ওয়া 'আলা আবসরিহিম গিশাওয়াতুন**- আর তাদের চোখে ছানি পড়েছে যেভাবে চোখের মনির ওপরে পর্দা পড়ে ছানির সৃষ্টি হয় আর তারা দেখতে পারে না। সুতরাং হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর যুগে মুসায়ী উম্মতের যে অবস্থা ছিল এর এক গভীর সম্পর্ক মসীহ্ (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের সাথে সম্পর্কিত। আর এটা জরুরী ছিল যে, সেসব নিদর্শন হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দিকে আরোপিত লোকদের মাঝে পাওয়া যায় যারা নিজেদের ব্যাধির কারণে একজন মসীহি সত্তার আকাঙ্ক্ষা করছিলো। যেভাবে প্রথম ব্যাধিগুলোর কারণে প্রথম মসীহ্র চাহিদা ছিলো আর যারা তাঁকে গ্রহণ করেছিলো মসীহ্ (আঃ) সে সব লোকের ব্যাধি দূর করেছিলেন। এটা জরুরী ছিলো যে, সে ব্যাধিগুলো পুনরায় যখন মাথা তোলে তখন সে পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র দ্বিতীয়বার আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। মসীহ্ (আঃ)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাবের এটাই গুঢ় রহস্য। কিন্তু যেসব লোকের চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে তারাও দেখতে পাচ্ছে না আর যারা বিচলিত হয়ে যায় যে, যদি আমরা দেখি তাহলে তো সত্যতা গ্রহণ করতে হবে আর দুনিয়ার ফাঁদ তাদেরকে এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে দেয় যে, তারা স্বাধীনভাবে সত্যতার দিকে ধাবিত হতে পারে, তাদের অবস্থাও অন্ধদের ন্যায় হয়ে যায়। কিছু এমন রয়েছে যারা শুনতে পারে না কেননা তাদের কানে মোহর মেরে দেয়া হয়েছে এবং তারা শুনতেই অক্ষম। এ অর্থে যে, দীর্ঘদিন অমনোযোগিতার কারণে দীর্ঘ দিনের বক্র বুঝ-ব্যবস্থার ফলে প্রকৃতপক্ষে তাদের সত্য-বাণী বোধগম্য হয় না; কিন্তু এমন লোকও আছে যারা ভয় পায়, পাছে তারা বুঝে ফেলে এ জন্যে তারা কানে আঙ্গুল দিয়ে থাকে। কুরআন করীমে অন্য স্থানে এসব লোকদের দৃষ্টান্ত দিয়েছে যে, যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখন মৃত্যুর ভয়ে তারা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দেয়। তাহলে বুঝা গেল যে, কিছু লোক বধির না হয়েও আহ্বানের ভয়ে নিজেদের কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে দিয়ে থাকে। তাহলে দেখা গেল যে, কিছু শ্রোতা এমন আছে যাদের অন্তর্দৃষ্টির যোগ্যতা আছে কিন্তু এর ভয়ে যে, পাছে তারা বুঝে ফেলে এবং বাধ্য হয়ে যায় আর তাকে অনুসরণ করতে হয় এবং ফলতঃ দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়। এজন্যে তারা শুনেও শোনে না।

এ পর্যায়ে পরিশেষে এ বাক্যটি বর্ণনা করা হয়েছে, "এরূপ না হয় যে, চোখে দেখে উপলব্ধি করে"। প্রথমে সেসব লোক রয়েছে যাদের উল্লেখ **খাতামাল্লাহু**-এর অধীন যে, তারা তো দীর্ঘকাল খারাপ কর্মের কারণে শুনা থেকেই বঞ্চিত হয়ে গেছে। দেখা থেকেই বঞ্চিত হয়ে গেছে আর তাদের অন্তর অমনোযোগী হয়ে গেছে। তাদের কোন কিছুই বুঝে আসে না। **আম 'আলা কুলুবিন আকফালুহা**- কুরআন করীম অন্য স্থানে এ বিষয়-বস্তুকে এভাবে বর্ণনা করেছে যে, যেন তাদের অন্তরে তালা লেগে গেছে। তালা লেগে যাওয়ার কারণে তাদের অন্তরে কিছু প্রবেশই করে না কিন্তু কিছু এমনও আছে যেখানে জিনিষ-পত্র আসা যাওয়া করে আর তালা লাগানই থাকে এবং ভাল জিনিসের জন্যে তারা তালা লাগিয়ে নেয় আর খারাপ জিনিসের জন্যে খুলে দেয় এদের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ (আঃ) বলেন ঃ

"তারা তাদের চোখ বন্ধ করে নিয়েছে যেন এরূপ না হয় যে, চোখ দিয়ে উপলব্ধি করে, কান দিয়ে শুনে আর অন্তর দিয়ে বুঝে এবং প্রত্যাবর্তন করে। আর আমি তাদেরকে আরোগ্য দান করবো কিন্তু তোমাদের চোখ

ধন্য হোক এজন্যে যে, তা দেখছে এবং তোমাদের কান (ধন্য হোক) যেহেতু তা শুনেছ। কেননা, আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি যে, বহু নবী ও ন্যায়-নিষ্ঠ-বান্দাদের বাসনা ছিলো যে, যা কিছু তোমরা দেখতে পাও তারাও যেন তা দেখতে পায়। কিন্তু তারা তা দেখতে পারে নি" (মথি-১৩ঃ ১৫-১৭ - অনুবাদক)।

এটা মসীহ্ (আঃ)-এর সে কথা যা অতি শান ও মর্যাদার সাথে হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর দ্বিতীয় আবির্ভাবের সময় সত্য প্রমাণিত হয়েছে এবং এতদ্দ্বারা আহমদীয়া জামাতকে বিশেষভাবে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে,

"কিন্তু ধন্য তোমাদের চক্ষু এজন্যে যে, তা দেখে আর তোমাদের কান (ধন্য) এজন্যে যে, তা শুনে! কেননা, আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি যে, বহু নবী ও ন্যায়-নিষ্ঠ বান্দাদের এ বাসনা ছিলো, যা কিছু তোমরা দেখতে পাও তারাও যেন তা দেখতে পায়। কিন্তু তারা তা দেখতে পারে নি"।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি কবিতার লাইন নিম্নরূপ ঃ

মাকামে উ মার্বি আজ রাহে তহকীর

বদওরানাশ রসূলা নায করদান্দ

অর্থাৎ, এ মসীহ্ (আঃ)-এর মকামকে ঘৃণার চোখে দেখো না। "বদওরানাশ রসূলা নায করদান্দ" তার সময়ের ওপরে তো রসূলগণ গর্ব করতেন। কোন কোন অ-আহমদী মৌলবী নিজেদের অজ্ঞতার কারণে অভিযোগ করেন, 'দেখাও কোথায় রসূলগণ মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগের জন্যে গর্ব করেছেন।' এসব অজ্ঞদেরকে জিজ্ঞেস করো, যদি মূসায়ী মসীহ্ (আঃ)-এর যুগের জন্যে রসূল গর্ব করে থাকেন তাহলে মুহাম্মদী মসীহ্ (আঃ)-এর যুগের জন্যে কেন গর্ব করবেন না? এ মুহাম্মদী মসীহ্ (আঃ)-এর যুগের প্রসঙ্গে স্বয়ং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ) সংবাদ দিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ রয়েছে। কত বড় মূর্খতা যে, মূসায়ী মসীহ্ (আঃ) যখন একথা বলেন, তখন বিনা চ্যালেঞ্জে তা গ্রহণ করা হয় আর বলা হয়- **আমান্না ওয়া সাদ্দাকনা** -আমরা ঈমান আনলাম ও সত্যায়িত করলাম। হ্যাঁ, হে মসীহ্! তোমার যুগ এমনই ছিলো যে, এর ওপরে রসূল গর্ব করতেন।

প্রাথমিক কালের নবীগণের দু'প্রকার সংবাদের উল্লেখ ঃ

যখন মুহাম্মদী মসীহ্ এ ঘোষণা দেন তখন তারা কানে আঙ্গুল দেয় আর বলে, তওবা তওবা কী কথা বলে গেছে। মুহাম্মদের মসীহ্ হয় আর তার যুগের ওপরে গর্ব করে কত বড় অবমাননা। তোমরা একে যত বড় অবমাননা মনে করো এর চেয়েও বড় অবমাননা তোমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর দরবারে করে থাকো। তাঁর মর্যাদার প্রতি অবমাননা করো। কেননা, তাঁর মকাম এবং তাঁর সেবকগণের মকাম-এ উভয় মকাম সম্বন্ধে কুরআন করীমে- **মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহে ওয়াল্লাযীনা মা'আহূ**- (মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ ও তাঁর সাথে যারা রয়েছে) এর মাঝে বলে দেয়া হয়েছে আর কেউই এ মকাম দুটোকে ভিন্ন করতে পারে না। আর সমগ্র দুনিয়াতে সকল যুগে অন্বেষণ করে দেখো মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সঃ)-এর মর্যাদার ন্যায় না কোন রসূল সৃষ্টি হয়েছে এবং এমন মর্যাদাপূর্ণ কোন অনুসারী সৃষ্টি হয়েছে? এতো মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এরই কল্যাণে হয়েছে। এ দুটো কথাই উপরোস্থ আয়াতের আলোকে দু'টো যুগেই প্রযোজ্য- প্রথম যুগেও এবং শেষ যুগেও। অতএব মসীহ্ (আঃ)-এর সে কথাকে- শুনো এবং দেখো এর মাঝে গভীর অর্থ নিহিত আছে এবং মসীহ্ আওওয়াল (আঃ) মসীহ্ সানী (আঃ)-কে কীভাবে সমর্থন করছেন। যেভাবে তিনি বলেছেন- কেননা, আমি তোমাদেরকে সত্যই বলছি, "বহু নবী এবং নিষ্ঠাবানগণের কামনা এই ছিল যে, যা কিছু তোমরা দেখতে পাও তারাও যেন তা দেখতে পায় এবং যেসব কথা তোমরা শুনতে পাও তারাও যেন তা শুনতে পায়। কিন্তু তারা শুনতে পায় নি"।

এখন হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর একটি উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ বিষয়টি শেষ করছি। অন্য বিষয়ে আর ছোট একটি কথাও বলা দরকার মনে করছি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন-

"দেখো! আজ আমি বলে দিয়েছি। পৃথিবীও শুনছে আর আকাশও। যে ব্যক্তি নিষ্ঠা পরিহার করে মন্দ কাজে ব্যাপৃত হবে এবং প্রত্যহ সে ব্যক্তি যে নিজের অপকর্মের দ্বারা পৃথিবীকে কলুষিত করবে তাকে ধরা হবে। খোদা বলেন- আমার শাস্তি অচিরেই পৃথিবীতে আপতিত হবে। কেননা, পৃথিবী পাপ ও গুনাহ্ দিয়ে পরিপূর্ণ। অতএব উঠো, আর সতর্ক হয়ে যাও যে, সে শেষ সময় নিকটবর্তী যে সম্বন্ধে নবীগণও সংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন" (তবলীগে রেসালত, ২০ খন্ড)।

এর মাঝে পূর্ববর্তী নবীদের দু'প্রকার খবরের উল্লেখ পাওয়া যায়। এক খবরের উল্লেখ সে কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়- "বদওরানেশ রসূলা নায করদান্দ" - যার বর্ণনা হযরত মসীহ্ (আঃ) তাঁর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, এ আমি আপনাদের সামনে পাঠ করে শুনিয়েছি। কিন্তু নবীদের মাধ্যমে আরও একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যা সতর্কতামূলক আদেশ আর এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন- "দেখ! আজ আমি বলে দিয়েছি। পৃথিবীও শুনছে আর আকাশও। প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিষ্ঠার পথ ত্যাগ করে কুকর্মে লিপ্ত হবে এবং প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে, নিজ কুকর্ম দ্বারা পৃথিবীকে কলুষিত করবে তাকে ধরা হবে। খোদা বলেন, আমার শাস্তি অচিরেই পৃথিবীতে আপতিত হবে। কেননা, পৃথিবী পাপ ও গুনাহ্তে পরিপূর্ণ। অতএব উঠো ও সতর্ক হয়ে যাও যে, সে শেষ সময় নিকটবর্তী যে সম্বন্ধে নবীগণও সংবাদ দিয়ে গিয়েছিলেন।"

কিন্তু এ খবরের লক্ষস্থল আহমদী নয়। এ খবরের সাক্ষী সেসব লোক যারা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে অস্বীকার করেছে আর নিজেদের অবহেলা ও অজ্ঞতা বা মূর্খতা অথবা বক্রতার ফলে তারা পুণ্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কুকর্মের প্রতি পাগলা ঘোড়ার ন্যায় দৌড়ে চলে যাচ্ছে। তাদের ধ্বংসের যুগ নিকটে। সর্বগ্রাসী ধ্বংসের সে ভবিষ্যদ্বাণী যা ইতোপূর্বে হয়ে গেছে, এখন যা আসার অপেক্ষায় রয়েছে, এখন যা পুরো হতে বাকী তা আগেরটার চাইতে অতি ভয়ানক হবে। এজন্যে সারা দুনিয়াকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবার জন্যে সেসব ভাগ্যবানদের কাজ করা দরকার যাদের ব্যাপারে খুব সুন্দর ভাষায় বরং ঈর্ষার সাথে পুরাতন নবীগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

জামাত আহমদীয়ার জন্যে শুভ সংবাদ ঃ

আপনারা কারা? আপনাদের সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"এ ধারণা করবে না, খোদা তোমাদের বিফল করে দেবেন (এ সতর্কবাণী নিজ জায়গায়, কিন্তু এটা তোমাদের জন্যে নয়)। তোমরা খোদার হাতে রোপিত একটি বীজ যা জমিতে রোপণ করা হয়েছে।" অতি সুন্দর কথা! কুরআন করীমে যেখানে যুর্ রা'আ বলা হয়েছে সেখানে বপনকারী ছিলো। এখন এ বিষয় মীমাংসা হয়ে গেছে যে, বীজ আসলে খোদার। বপনকারী হাত মানুষেরই হোক না কেন, কিন্তু যে বীজের কথা বলা হয়েছে তা খোদার)। অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন,

"তোমরা খোদার রোপিত একটি বীজ যা জমিতে বপন করা হয়েছে, খোদা বলেন- এ বীজ অঙ্কুরিত হবে এবং ফুলে ফলে সুশোভিত হবে আর প্রতিটি দিকে এর শাখা বের হবে এবং একটি মহামহীরূহে পরিণত হবে। অতএব কল্যাণমন্ডিত সেই ব্যক্তি যে খোদার কথায় ঈমান রাখে এবং অন্তবর্তীকালীন সময়ে আসতে পারে এমন বিপদ-আপদে ভয় না পায়। কেননা, বিপদ আপদ জরুরী যেন খোদা তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যে, কে তার বয়াতের দাবীতে সত্য আর কে মিথ্যেবাদী ...।" এ পরীক্ষার সময়ে কিছু শুকনো পাতা ঝরে যায়। কিছু শুকনো ডাল-পালা ভেঙ্গে যায় এবং জ্বালিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু যা কিছু বেঁচে যায় তা অধিক ক্রমবিকাশ লাভ করে এবং বিস্ময়করভাবে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয় আর ফল দিতে থাকে। সুতরাং হতভাগ্য সে, যে পরীক্ষার যুগে পদস্খলিত হয় এবং বসন্তের যুগ দেখার সৌভাগ্য লাভ করে না"।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) পুনরায় বলেন-

"... যে ব্যক্তি কোন পরীক্ষার সময়ে পদস্খলিত সে খোদার কোন ক্ষতি করবে না আর তার দুর্ভাগ্য তাকে জাহান্নামে পৌঁছে দেবে। যদি সে জন্মগ্রহণ না-ই করতো তাহলে তার জন্যে তা মঙ্গলজনক ছিলো। কিন্তু সেসব লোক যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে ..."।

এর মাঝে আল্লাহ্তাআলার ফযলে সমগ্র দুনিয়ার আহমদীগণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন যারা গত পরীক্ষার যুগে দীর্ঘ ধৈর্যের নমুনা দেখিয়েছেন। কাউকে সরাসরিভাবে দুঃখে-কষ্টে নিপতিত করা হয়েছে। কাউকে নিজেদের প্রিয়গণের দুঃখ-কষ্টে ব্যথিত করা হয়েছে। এদের সবার জন্যে শুভ সংবাদ যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন-

"কিন্তু সেসব লোক যারা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে, তাদের ওপরে বিপদাবলীর ভূমিকম্প আসবে, দুর্ঘটনার ঝড় বইবে, জাতিগণ তাদের প্রতি হাসি-বিদ্রূপ করবে আর জগৎ তাদের প্রতি ঘৃণাসূচক ব্যবহার করবে, কিন্তু পরিশেষে তারা বিজয় লাভ করবে, এবং কল্যাণের দ্বারসমূহ তাদের জন্যে উদ্ঘাটিত হবে" (আল্ ওসীয়্যত)।

এটা সেই দ্বিতীয় যুগ যার মাঝে খোদার অনুগ্রহে জামাতে আহমদীয়া প্রবেশ করেছে। যদিও এ সময়ে কখনও জামাতে আহমদীয়ার জন্যে কল্যাণের দরজাসমূহ বন্ধ হয় নি বরং অতি তীব্রবেগে কল্যাণের নতুন নতুন দরজাসমূহ খোলা হচ্ছে, এমন কি মনে হয় যে, আকাশ থেকে কল্যাণসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে প্রতিটি দিন নতুন নতুন দরজা উন্মুক্ত করা হচ্ছে এবং অঢেল কল্যাণ অবতীর্ণ করা হচ্ছে। এটা সে যুগ যে, কখনও কখনও এরূপ মনে হয় যে, কল্যাণসমূহ শামলানোই দায় হবে। সেসব লোক যারা বাগ-বাগিচার অভিজ্ঞতা রাখেন তারা অবহিত আছেন, এক যুগ এরূপ হয় যখন অপেক্ষা করতে হয় আর কখনও টক ফলও হাতে এসে যায় তখন মানুষ ওগুলোকে দেখে-শুনে স্বাদ গ্রহণ করে। কিছু স্বাদ গ্রহণ করে এবং অপেক্ষা করতে থাকে যে, কখন ফল পাকা ধরবে আর কখন কোন পাকা ফল হাতে এসে যাবে। পরে সে যুগ আসে যখন ফল পাকতে আরম্ভ করে। আবার এমনভাবে পাকে যে, জমির মালিকও শামলাতে পারে না। মালীও শামলাতে পারে না। আর আগে তো একটি একটি করে ফল সংরক্ষণ করা হতো কিন্তু বর্তমান অবস্থায় জমির মালিক কখনও কখনও সাধারণ আহ্বানের ব্যবস্থা করে থাকেন। আস আর ফল পাড় আর যত ইচ্ছা খাও। তাই খোদার অনুগ্রহ এভাবে অবতীর্ণ হতে থাকে। আর আমি এটা বুঝতে পারছি বরং দেখতে পাচ্ছি যে, আহমদীয়তের জন্যে সে যুগ নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে। এখন আকাশ থেকে সেরূপ বেগে ফল পড়তে থাকবে যে, ওগুলো শামলানোর সময় এসে দাঁড়িয়েছে। কেননা, ফল পেকে গেছে এবং সারা দুনিয়া ইনশাআল্লাহ্ এসব কল্যাণের সাক্ষ্য দেবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি ইলহাম আছে যে প্রসঙ্গে প্রথমে আপনাদের সামনে একটি ভূমিকা রাখতে চাই।

চতুর্থ খেলাফতের সাথে সম্পর্কিত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি ইলহাম ঃ

আপনাদের অধিকাংশেরই হয়ত মনে নেই, যেভাবে আমারও মনে ছিলো না যে, আল্লাহ্তাআলা আমাকে এক বৃহস্পতিবার খেলাফতের আসনে সমাসীন করেছেন আর তা ছিল জুন মাসের ১০ তারিখ। পরের দিন ১১ তারিখ ছিলো জুমুআর দিন। কাল ইমাম সাহেব নামাযে আসার সময়ে আমাকে বল্লেন, "মোবারক হোক"। আমি বল্লাম, "কিসের মোবারক"? আমার তো কোন বিশেষ বিষয়ের খেয়াল ছিলো না। আমি বল্লাম, "বাইরে থেকে কি কোন ভাল খবর এসেছে?" তিনি বল্লেন, "আপনার খেলাফতের একাদশ বছর পুরো হয়ে গেছে এবং দ্বাদশ বছর শুরু হতে যাচ্ছে" এর ওপরে চিন্তা করতে গিয়ে আমার মন আরেকটি ইলহামের দিকে চলে গেলো আর তা এই ঃ

বা'দ ১১ ইনশাআল্লাহ্তা'লা (আল্লাহ্র ইচ্ছায় ১১-এর পরে)। এইতো পরশু দিন আমাদের ঘরে এ ইলহামের কথা সম্বন্ধে আলাপ হচ্ছিলো। তখন আমি বলেছিলাম, খোদার নিকট এটা নির্ধারিত হোক যে, আমাদের হিজরতের ১১ বছর পুরো হোক আর ১১ বছর পরে আমরা যেন আমাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাই। যখন ইমাম সাহেব বল্লেন, আপনার খেলাফতের ১১ বছর পুরো হয়ে গেছে এবং দ্বাদশ বছের পদার্পণ করছে। তখন আমি বললাম, তাহলে তো আমাকে খোদার ওপরে সুধারণার বশবর্তী হয়ে এটা বলা উচিত যে, এই ইলহামের সে রঙ্গেও পুরো হবার দিন এসে গেছে যে, চতুর্থ খেলাফতের একাদশ বছর অতিক্রান্ত হলে ইনশাআল্লাহ্ কিছু অবশ্যই হবে, কী হবে? এর সম্পর্ক আসলে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার সাথে জড়িত। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যদিও এ ইলহামকে বাবু ইলাহী বখ্শের মৃত্যুর ব্যাপারে নির্ধারণ করেছেন; কিন্তু যতটা সাধারণভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় তাতে মৌলিক কথা এটাই বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ কথা সে ইলহামের সাথে নিশ্চিৎ সম্পর্কযুক্ত যে, এ ইলহাম আমার সত্যতা সাব্যস্ত করার লক্ষ্যে প্রকাশিত হবে এবং বড়ই শান ও মর্যাদার সাথে

হবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) দেশ বিভাগের সময়, তাঁর হিজরতের সময়ের সাথেও এ ইলহামের বিষয়-বস্তুকে সংবদ্ধ করেছেন। তাহলে কোন কোন জিনিষ বিভিন্ন-মুখী অর্থসম্বলিত হয়ে থাকে। একটি মর্যাদার সাথেও পুরো হয়, দ্বিতীয় ভাবেও ঃ তৃতীয়ভাবেও। কিন্তু আমি মনে করি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এ ইলহামকে যতটা মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং যে অসাধারণ নিদর্শনের আকারে একে উপলব্ধি করেছেন, অসম্ভব নয় যে, সে যুগ এখন নিকটে ঘনিয়ে এসেছে। কেননা, পাকিস্তানে বিশেষভাবে আর অন্যান্য দেশেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ওপরে মিথ্যারোপের সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অসভ্যতার কোন কথাই বাকী রাখা হয় নি। এজন্যে এর মোকাবেলায় খোদাতাআলার তরফ থেকে বিশ্ব-নিদর্শন প্রকাশ হওয়া উচিত। একটি নিদর্শন তো বর্তমানে আপনারা দেখছেন যে, আল্লাহ্তাআলা সারা দুনিয়ার জামাতকে একটি জুমুআয় এক হাতে একত্র হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন আর দুনিয়ার কোণে কোণে একটি স্থানও এমন নেই - না উত্তরে, না দক্ষিণে, না পূর্বে আর না পশ্চিমে-যেখানে জামাতে আহমদীয়ার ইমামের খুতবা জুমুআ দেখা এবং শুনা না যাচ্ছে। তাহলে এটাই একটি বড় নিদর্শন। কিন্তু ১১ এর পরে নয়। এজন্যে আমি মনে করি যে, ১১ এর পরে এথেকে অনেক বড় নিদর্শন হবে অথবা এ নিদর্শনেরই কোন এরূপ মহিমা প্রকাশ পাবে যদ্বারা আল্লাহ্র অনুগ্রহে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার সাক্ষ্য দেবার জন্যে জাতিসমূহের প্রাণ তৈরী হবে আর এই যে খরার যুগ, দুর্বিপাকের যুগ চারিদিকে ছেয়ে গেছে এ যুগ ইনশাআল্লাহ্ বসন্তের যুগে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এ আকাঙ্ক্ষায় আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতি আপনাদের সম্মুখে রাখছি। তিনি বলেন ঃ

"আমি কখনও এ বিশ্বাস রাখি না যে, আমি সে সময়ের পূর্বে মারা যাই যখন পর্যন্ত আমার সর্বশক্তিমান খোদা মিথ্যে আপত্তিসমূহ থেকে আমাকে অব্যাহতি ...প্রমাণিত না করেন ..."

একটি যুগ এমনও আছে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর তিরোধানের পূর্বে বহু নিদর্শনের আকারে প্রকাশিত হয়ে গেছে আর সেসব নিদর্শনাদির মাঝ থেকে মিথ্যেবাদী এলাহী বখশের মৃত্যুও ছিলো যার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। পুনরায় তিনি বলেন ঃ

এর ব্যাপারে নিশ্চিৎ ও দৃঢ়-বিশ্বাসের সাথে আমার কাছে ১১ ডিসেম্বর, ১৯০০ রোজ বৃহস্পতিবার এ ইলহাম হোল -

বর মকামে ফালক শুদা ইয়া রব্ব্

গর উমীদে দহম মাদার 'আজব

১১-এর পরে ইনশাআল্লাহ্। আমি জানিনা যে, ১১ দিন না ১১ সপ্তাহ বা ১১ মাস অথবা ১১ বছর কিন্তু যাই হোক একটি নিদর্শন আমার দোষ-মুক্তির জন্যে এ সময় সীমার মাঝে প্রকাশিত হবে" (আরবাঈন নম্বর ৪, ২১ পৃষ্ঠা টীকা দ্রষ্টব্য)।

যেভাবে আমি বর্ণনা করেছি যে, কোন কোন ইলহাম বিভিন্নমুখী অর্থসম্বলিত হয়ে থাকে। ১১ বছর পর্যন্ত তিনি বলেছেন, একটি মর্যাদার সাথে পুরো হয়েছে। যদি তা এর শেষ সীমা হতো তাহলে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ), হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সারা জামাতের মধ্যে যাঁর অধিক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়েছিলো তিনি কখনও এটা বলতেন না যে, আমার হিজরতের উপলক্ষ্যে এ ইলহাম আরোপিত হয়েছে। এজন্যে তাযকিরার নীচে এ টীকা রয়েছে যে, কোন কোন ইলহাম বিভিন্নমুখী অর্থসম্বলিত হয়ে থাকে। তাই এটা যদি এক অর্থে পুরো হয়ে থাকে তাহলে অন্য আর এক অর্থেও পূর্ণ হতে পারে যার মৌলিক সম্পর্ক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার সাথে অবশ্যই হবে। এ বিষয়-বস্তু যা আমি আপনাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছি, যেন এজন্যে দোয়ার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং বিশেষভাবে দোয়া করেন যে, ১১-এর পরে যে যুগ আরম্ভ হতে যাচ্ছে এটা আল্লাহ্তাআলা প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত কল্যাণ দ্বারা ভরে দেন। তিনি বলেন ঃ

"বর মকামে ফালাক শুদা ইয়া রব্ব্

গর উমীদে দহম মাদার 'আজব

খোদাতাআলা বলেন যে, তোমার দোহাই (কাতরোক্তি পূর্ণ দোয়া) এখন আকাশে পৌঁছে গেছে ...।"

জামাতে আহমদীয়ার আজকের দোহাই-এর সাথে এ বিষয়-বস্তুর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কষ্টের এক দীর্ঘ সময় চলে গেছে। পাকিস্তানে আহমদীগণ এতই কষ্ট স্বীকার করেছে যে, প্রকৃতই আহমদীদের কোন কোন রাত (কাতরোক্তি পূর্ণ) দোহাই দিতে দিতে চলে গেছে আর ধারাবাহিকতার সাথে দোহাই দিচ্ছে। 'দোহাই' শব্দ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ব্যবহার করেছেন। এথেকে অধিক এ বিষয়-বস্তু আর বর্ণিত হতে পারত না এবং জামাতে আহমদীয়ার অবস্থার ওপরে এটা উৎকৃষ্টতরভাবে সত্য বলে প্রমাণিত। তাই 'দোহাই' শব্দটির এ প্রয়োগ অতি আদরের। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন -

"... তোমার দোহাই এখন আকাশে পৌঁছে গেছে। এখন যদি তোমাদেরকে আমার কোন বাণী ও সুসংবাদ দেই তবে আশ্চর্য হয়ো না। এটা আমার সুন্নত এবং অযাচিত দানের বিরোধী নয়। ১১-এর পরে ইনশাআল্লাহ্।"

তিনি বলেন, তাঁর বোধগম্য হোল না। তখন এক বার আশা প্রকাশ করলেন যে, এর অর্থ হবে, কিন্তু সাথে আরও একটি সম্ভাবনার কথা এটা বলে প্রকাশ করে দিলেন যে, তাঁর বোধগম্য হলো না অর্থাৎ যে অর্থ আমি বর্ণনা করেছি আমি আশা ও ভরসা অনুযায়ী বর্ণনা করছি। আল্লাহ্তাআলার তরফ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে বোধগম্য হয় নি। অতএব যখন খোদা দরজা উন্মুক্ত করে রেখে দিয়েছেন তখন কেন আমরা ভরসা রাখবো না যে, এ যুগেও খোদা সে ইলহামকে সেই শান ও মর্যাদার সাথে পুরো করেন যে, সারা জগতে প্রতিটি দিকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সত্যতার ডঙ্কা বাজতে থাকে। আল্লাহ্ করুন যেন এরূপই হয়। আমরা নিজেদের কানে যেন এসব সত্যায়নের বাঁশী শুনতে পাই। নিজেদের চোখে বিজয়ের যুগের ঢেউ যেন দেখতে পাই। আর আমাদের চোখ স্নিগ্ধতা লাভ করে এবং অন্তরও উৎফুল্ল হয়। আল্লাহ্ করুন যেন এরূপই হয় আর শীঘ্র শীঘ্র হয়। (আখবারে আহমদীয়ার আগষ্ট-ডিসেম্বর ১৯৯৩ সংখ্যার সৌজন্যে, পুনঃ প্রকাশ)।

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

ইসলাম ও পারিবারিক জীবন

আমরা মানুষ। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সৌধ নির্মাণের জন্য যে ইট ব্যবহার করতে হবে তার ওপরে অর্থাৎ ব্যক্তির চরিত্র ও গুণাগুণের ওপরেই বেশি জোর দিয়েছে ইসলাম। ব্যক্তির সমষ্টিতে পরিবার গঠিত হয়। তাই পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে ইসলামের শিক্ষার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যগুলো সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। দ্রুত সফলতা লাভের জন্য বা আমরা যাকে বলি রাতারাতি বড় লোক হবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন মানুষ খুবই অসৎ উপায় অবলম্বন করে। অথচ পবিত্র কুরআন আমাদেরকে প্রতিযোগিতার পথ নির্দেশ করছে। তবে তা সাধুতার উপর নির্ভর করে।

প্রত্যেকের জন্যই কোন না কোন লক্ষ্যস্থল রয়েছে, যার প্রতি সে মনোযোগী হয় (বাকারা ঃ ১৪৯)। সুতরাং তোমরা পুণ্য অর্জনে পরস্পর প্রতিযোগিতা কর। এস্থলে পুণ্য কাজের বিবরণ অতি ব্যাপক। সাধারণত আমরা সেটাকে সহজভাবে বলতে পারি, তাকওয়ার মাধ্যমে কাজ করা। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে যে কাজ করা হয় সেটাই পুণ্য কাজ। ভাল কাজের জন্য অসৎ উপায়ে অর্থলাভ পুণ্যের কাজ হ'তে পারে না। পাঞ্জাবের এক অঞ্চলে মুহাম্মদ খাঁ নামে এক লোক ছিল। পরে ডাকাত মুহাম্মদ খাঁ নামে খ্যাতি লাভ করে। সে বিত্তশালীদিগের সম্পদ লুণ্ঠন করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করত। সে ছিল মুর্খ। তবে হাল জমানায় শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত, উন্নত সমাজ এবং উন্নত দেশগুলোও শান্তি ও ইনসাফের নামে অশান্তি ও অন্যায় সৃষ্টি করে চলছে।

সুতরাং মুসলমান হিসাবে সব রকমের প্রতিযোগিতায় ও সফলতা লাভের জন্য সাধুতাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। মানসিক শান্তি সাধুতার দ্বারা হয়। অলসতা বা অবৈধ উপায়ে নয়। আমি এমন মজুর দেখেছি যারা পাঞ্জাবে গ্রীষ্মকালীন প্রখর রৌদ্রে কাজ করে, শুধু মরিচ বাটা দিয়ে রুটি খেয়ে দিব্যি ঘুম দিচ্ছে। আবার এমন বিত্তশালীও দেখেছি যারা Air Condition রুমে থেকে Sleeping Tablet খেয়েও ক্ষণিকের ঘুম উপভোগ করতে পারে নি। তবে সব ধনী বা বিত্তশালীদের বেলায় এরূপ হয় না।

এ প্রসঙ্গে আমি হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খান সাহেবের দৃষ্টান্ত দিব। United Nations অথবা International Court of Justice এর প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন একবার একটা বিশেষ কাজে তাঁর অফিসের কর্মচারী তাঁকে তাঁর ঘুমে ব্যাঘাত ঘটার ভয়ে জাগান নি। সকালে সে বিষয়ে জানার পর তিনি তাদেরকে বলেন, টেলিফোন তো আমার পার্শ্বেই থাকে। তারা বলল, স্যার আপনার নিদ্রার ব্যাঘাতের কারণে ফোন করি নি। তিনি বলেন, আমি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘুমুতে পারি।

অসাধুতা বা অন্যায়ভাবে যারা রাতারাতি বড় হয় তারা নিজ অন্তরে বা সমাজেও শান্তি পায় না। বাহ্যদৃষ্টিতে মনে হয়, তারাই যেন সব মজা লুটছে অথচ এটা মরীচিকার মত। হযরত সাহেব (আইঃ) প্রশ্নোত্তরে বলেছেন, পাকিস্তানের এক কোটিপতির বন্ধু হযরত সাহেবকে (আইঃ) তার কোটিপতি বন্ধুর হতাশার কাহিনী বলেছেন। একবার তিনি তার বন্ধুর বিরাট সাফল্যে তাকে মুবারকবাদ জানান। কিন্তু তিনি খুশী না হয়ে অতি দুঃখজনক প্রতিক্রিয়া দেখালেন। তিনি জামার বোতামগুলো খুলে নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, নরকে যাক সেই সফলতা। কেউ যদি আমার বুক চিরে দেখে তবে দেখবে, ভিতরে আগুন জ্বলছে। এটা বাস্তব সত্য। তবে কেউ স্বীকার করে, আবার কেউ স্বীকার করে না। ভাগ্যের লিখন বলে ছেড়ে দেয়। আহমদীদের বেলায় স্বতন্ত্র এবং এটাই হওয়ার কথা। কারণ গোটা পরিবারই বহু রকমের চাঁদাও আর্থিক কুরবানী আদায় করে। আল্লাহ্‌র জন্য যে যত বেশি কুরবানী করবে সে তত সওয়াব হাসিল করবে। তবে আমি কুরবানী বলতে, পবিত্র কুরআনের রিয্‌ক বুঝাচ্ছি তা মাত্র টাকা/পয়সার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রতি নির্দেশ করে।

একটি দিক অবশ্যই আমি স্পষ্ট করে বলব আর তা হলো মুসলমানের আর বিশেষ করে আহমদী মুসলমানের জীবন যাত্রার মাপকাঠি কী হবে। অবশ্যই পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও কুরআনের বাহক ও সাধক হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূত ও পবিত্র জীবনী।

আমাদের নবীজী পানাহারে কীরূপ জীবন কাটিয়েছেন অর্থাৎ হাল জমানার ভাষায় কত গরীব ছিলেন, ইতিহাস তার সাক্ষী। অথচ নবীর উম্মত হয়ে এটাকেই আমরা জীবনের প্রধান মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করি। কত পার্থক্য আমাদের দাবীতে ও আমাদের জীবন যাত্রায়। অমুসলিমরা খোদার বা নবীর কথা বলে না। তাদের নেশা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা যা চায় তার জন্য প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম করে। আমরা আল্লাহ্ ও রসূলের দোহাই দিই, অথচ কর্মকান্ড ভিন্নরূপ। এখানে আপনাদিগকে একটি কথা বলতে চাই, যদি কেউ মনে করেন, দুনিয়াতে বাস করে অথচ নির্বোধের মত দুনিয়াকে উপেক্ষা করে, এরূপ ভাবলে ভুল করবেন। কারণ পবিত্র কুরআনের এ অপূর্ব কথা আমার মন-মানসে সদা জাগরুক ঃ

রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসনাতাঁওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাঁওয়াক্বিনা আযাবান্নার

ওয়া মিনহুম মাইঁয়াকুলু রব্বানা আতিনা ফিদ্দুনয়া হাসানাতান ওয়ামা লাহূ ফিল আখিরাতি মিন খালাক্

পবিত্র কুরআন মজীদে আরো বলেছে ঃ

"এবং আমরা তাদের মধ্য থেকে কতক লোককে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যের যা কিছু উপকরণ উপভোগের জন্য দিয়েছি, তার প্রতি তুমি তোমার চক্ষু কখনও বিস্ফারিত করে দেখবে না। কারণ এর দ্বারা আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করি এবং তোমার প্রতিপালকের রিয্‌ক সর্বোত্তম এবং অধিকতর স্থায়ী (ত্বা-হা ঃ ১৩২)।

বাস্তবে এক খোদার প্রতি বিশ্বাস এবং অল্প খেয়ে, অল্প পরে তুষ্ট থাকা কার্যকর। খোদাতাআলা মানুষকে দিতে পারেন এ কথা মুখে বলে লালসার দৃষ্টিতে শুধু তাকানোই নয় বরং তার জন্য ক্ষোভ ও দুঃখ করা মোটেই সমীচীন নয়। আমরা যদি এ মোহ কাটিয়ে উঠতে পারি তবেই ইসলামী পরিবার বা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব।

ইসলামী পরিবারের আদর্শ মাপকাঠি হলো সাধুতা, যার ইঙ্গিত আগেই দেয়া হয়েছে। এটা একটা সুন্দর খেলা। সাধুতার মাঠে আপনি যা-ই খেলুন এবং যে স্থানেই খেলুন তা হবে সুষ্ঠ, হবে সমৃদ্ধ ও দর্শনীয়। ইসলামী পরিবারের সৌধ প্রস্তুত কল্পে আমরা যে ইট ব্যবহার করি তা যদি পাকাপোক্তা হয় তবে ইমারতও মজবুত হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র

কুরআন পথ-নির্দেশ করছে ঃ

কুআনফুসাকুম ওয়া আহলীকুম নারান-

তবে প্রায়শ শুনা যায় যে, যখনই তারবিয়ত বা সংশোধন সম্পর্কে বলা হয় তখনই তরবিয়তে আওলাদ বা প্রজন্মের কথা ও সে বিষয়টি নিয়ে বক্তৃতা করা হয়। অথচ দেখা যায় বক্তার নিজের জীবনই অসার এবং সেই জলাশয় আগাছায় পরিপূর্ণ অথচ প্রথমে জলাশয় শৈবালমুক্ত হওয়ার কথা কুরআন নির্দেশ দেয় ঃ কুআনফুসাকুম। নদী যদি কচুরীপানায় ভর্তি থাকে তবে সে তার স্রোত হারিয়ে ফেলে এবং ফলে সময়মত তরী চলতেও পারে না এবং ঘাটেও ভীড়ে না। ফলে নদীটি স্বয়ং নির্জীব হয়ে পড়ে। এমন নদীর বেলায় কবি বলেছেন,

"যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।

যে জাতি জীবন হারা অচল অসার পদে পদে বাঁধে তার জীর্ণ লোকাচার"॥

তাই পরিবারের প্রধানকে সর্বপ্রথম আদর্শ হতে হবে। প্রথমেই পিতার কর্তব্য আদর্শবান হওয়া। দ্বিতীয়তঃ মায়ের। এমন আদর্শবান পিতাকেই আর **রিজালু কুওওয়ামূনা** বলা হয়েছে। আর আদর্শ মাতার সম্পর্কে বলা হয়েছে **আল জান্নাতু তাহতা আক্বদামি উম্মাহাতিহাতুম**। অন্যথায় সেই কাহিনীর অবস্থা হবে। যেখানে এক যুবকে তার অন্যায়ের ফলে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলানোর সময় বলা হলো কোন ইচ্ছা থাকলে বলার জন্য। সে বলল, মাকে কাছে আন। মা কাছে আসলে পর সে বলল, মা জিহ্বা বের কর। মা তখন জিহ্বা বের করলে সে দেয় এক কামড়। দর্শকরা বলল, হতভাগা মরার সময়ও অপকর্ম করল। সে বলল, অপকর্ম নয় বরং উচিত কর্মই করেছি। কারণ আমার অপকর্মে ইনিও শরীক। তিনি কোন সময়ই আমাকে বারণ করেন নি। সম্ভবতঃ এটা সত্য ঘটনা বা বাস্তব না হলেও এতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

ব্যক্তির ইসলাহ বা সংশোধনের পর পরিবার গঠনের প্রশ্ন উঠে। ইসলাম ধর্মানুযায়ী পরিবার গঠিত হয় বিবাহের মাধ্যমে। তাই এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমরা ইসলামে পারিবারিক জীবন নিয়ে কথা বলছি। বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর উপদেশ হলো মানুষ কোন সময় খানদান, কোন সময় সৌন্দর্য, কোন সময় ধন-দৌলত দেখে বিয়ে করে। তবে তোমরা ধর্মীয় দিকটাকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে ভাল করে বুঝতে হবে। তা হলো পুরুষকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে, নেক মেয়ে দেখতে হবে। তা হলে কি আঁ হযরত পুরুষকে বাদ দিয়েছেন অর্থাৎ ছেলেটি কেমন তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে না? অবশ্যই ছেলেকেও এ কষ্টি পাথরে যাচাই করতে হবে। নতুবা এটা আদল বা ইনসাফের খেলাফ ও মহানবীর মহাজ্ঞানের বিপরীত হবে, যা অসম্ভব। আসলে তিনি পুরুষের অভিভাবককে লক্ষ্য করে কথা বলেছেন। অন্যথায় এটা হবে, পুরুষ যাই হোক না কেন তার জন্য ভাল মেয়ে চাই। যদি এমনটি হয় তবে অন্যায় ও অবিচার হবে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ এক প্রশ্নোত্তর কালে এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। প্রশ্ন ছিল, ছেলের পক্ষ স্বপ্ন দেখেছে মেয়ে ভাল, তবে মেয়ের পক্ষ ছেলের বিষয়ে ভাল দেখে নি। এখন একই রিশ্‌তা সম্পর্কে দু'রকমের স্বপ্ন এক খোদার তরফ হতে কীভাবে হয়? উত্তরে যুগের নেতা বলেন, এতে কোন প্রকার অসংগতি নেই। স্বপ্ন সঠিক। ব্যাখ্যা হলো ছেলেটির জন্য মেয়েটি ভাল তবে, মেয়েটির জন্য ছেলেটি ভাল নয়। আবার উল্টাও হয়ে থাকে। খুবই চমৎকার ও প্রজ্ঞাময় ব্যাখ্যা। এ হাদীসটির প্রকৃত অর্থ না জানার কারণে অনেক প্রজ্ঞাহীন শিক্ষিতরা ইসলামকে বদনাম করে। মরক্কোর একজন মুসলমান সিডনীর এক যুবতীর সাথে ভাব করেছে। যখন মেয়েটি তাদের দেশে রেড ক্রসের মাধ্যমে সেবার জন্য গিয়েছিলো। প্রথমে ভালবাসার কারণে কথাবার্তা বলে ভবিষ্যতের বিষয়গুলো নির্ণয় করা হয় নি। পরে যখন বাস্তবে ফিরে আসে তখন আসল চেহারার মুখোশ খুলতে আরম্ভ করে।

একবার এক মিটিং-এ মেয়েটি আমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের নবী কি একরোখা নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ সে লোকটি আমাকে বলেছে, নবীর হাদীস এমনই এবং তারা আরবী জানে। আমি বললাম, এমন ধারণা নবীজীর প্রজ্ঞার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। নবীজী প্রথমেই পুরুষকে ভাল হবার ও ভাল থাকার কথা বলেছেন এবং তারপর ভাল পাত্রী তালাশ করার কথা বলেছেন। এস্থলে একটি বিষয়ে সামান্য আলোচনা সমীচীন বোধ করি। আল্লাহ্‌র বাণী ও রসূলের সুন্নতের পর বা কোন কোন সময় এ দু'টি বিষয়ে উদাসীন হয়ে সামাজিকতার মুখোশটায় একটু বাড়াবাড়ি করা হয়। ফলে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়। এটা অস্বীকার করা ঠিক হবে না যে, সমাজেরও একটা দাম আছে। তবে সেটা যদি মূল বিষয়গুলোকে ঢেকে ফেলে তবেই বিপদ এবং বিশেষ করে আহমদীদের বেলায় এটা মহা বিপদ হতে পারে। আমাদের আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন। আমাদের রসূল রহমাতুল্লিল আলামীন। আমাদের খলীফা আমীরুল মু'মিনীন। আমরা যদি মূলমন্ত্রের উপর সামাজিকতাকে প্রাধান্য দেই তবে আমাদের বিশ্বজনীন মন্ত্রটি মাঠে মারা পড়বে। একমাত্র উপমহাদেশের তিনটি দেশের সামাজিকতার আবর্জনার স্তুপ সৃষ্টি করবে। ফলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। এবং রবীন্দ্রনাথের বাসনা শুধু আশাই থেকে যাবে

আজি এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে
এসো হে আর্য এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো হে খৃষ্টান!

যার ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আহমদীদের বিয়ে -শাদীর কথাতে তো সামাজিকতার চাপ বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। ফলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বন্ধন ও মিলন সেতু স্বপ্নই থেকে যাবে। I am not in dream world। আমি বাস্তাবের ও অভিজ্ঞতার কথাই বলছি। সামাজিক ভারসাম্যহীনতার কারণে Immigration -এও ঝঞ্ঝাট বাঁধে। ছেলে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে Guardian-দেরকে সময়মত দোয়া ও তদবীর করতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, মা-ও এদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। তারপর তারা যখন বয়স্ক হয়ে পড়ে তখন বয়স একটা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। এটা খেলা নয়। বরং জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়।

বিয়ের পর একটা দীর্ঘ সময় নব বিবাহিতদেরকে ভালভাবে দেখা-শুনা করা উচিত। সর্বোপরি উভয়ের মাতা-পিতা আত্মীয়-স্বজন এমনকি জামাতের কর্মকর্তাগণকেও এ ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে। আমি লক্ষ্য করেছি, কোন কোন সময় শিক্ষিত ও বিদ্বান পরিবার নিজ কন্যার বেলায় যা করে বউ এর বেলায় তা করে না। যেমন মেয়েকে প্রত্যেক বছরই নিজ বাড়ীতে

আনবে। বউকে বাপের বাড়ী যেতে দিবে না। ফলে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। যা হোক বলছিলাম, প্রাথমিক অবস্থায় নব-দম্পতিকে নজরে রাখতে হবে। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে। তবে এটা এক তরফা হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় বা সমীচীন নয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, **খালাক্বাকুম মিন নাফসীন ওয়াহিদাতিন** আমি নাফসীন ওয়াহিদাতিন থেকে বুঝি, ছেলে ও মেয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাসনা ও কামনা এক রকমের কারণ উভয়েই একই উপাদান হতে সৃষ্টি। তাই একের উপর অপরের প্রাধান্য নেই। হ্যাঁ, তাকওয়ার প্রাধান্য আছে এবং সেটা দিয়ে আল্লাহ্‌র কৃপা লাভ হয়। তবে সমাজের মাঝে একে অপরকে সাথে নিয়ে জীবন-তরী চালিয়ে যাবে ও সুখে - দুঃখে সংগী থাকবে এটাই নিয়ম।

একটা বিষয় আরো বিশেষ করে লক্ষ্যণীয়, সন্তান-সন্ততি এমনকি কয়েকটি সন্তানের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছেলেরা বলে, এখন আর সাথে থাকা বা সাথে নিয়ে চলা যাবে না। তাই পৃথক করুন। এটা যেমন কষ্টকর তেমনিই বিষময় ও তিক্ত এবং লজ্জাকর। বিশেষ করে মেয়েদের জন্য এটা গুরুতর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। উপমহাদেশের সামাজিক কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের কারণে মেয়েদের জন্য পুনরায় বিবাহ দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। আবার ছোট ছোট সন্তানের জন্য খুবই শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে। একটা বড় ধরনের বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় যখন মেয়েই হয়। প্রায়ই এটা মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। আমি Medically এ ব্যাপারে অনুশীলন করছি না, কারণ হয়তো বুঝা একটু মুশকিল হবে। আমি ইতিহাসের দিকটাই দেখাব। প্রথম পবিত্র কুরআনেই এর মুখোশ খুলছে যে, কাউকে মেয়ে দেয়া হয়, কাউকে ছেলে দেয়া হয়, কাউকে উভয়ই দেয়া হয়। আবার কাউকে কিছুই দেয়া হয় না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করেছে যা অতি সাধারণ ব্যক্তিও অনুধাবন করতে সক্ষম। হযরত ঈসা (আঃ)-এর নানীর কাহিনী। তিনি যখন গর্ভবতী তখন খোদার দরবারে আকুলভাবে আবেদন করেছিলেন, প্রভু হে! আমার গর্ভে যা আমি তা তোমার পথে ওয়াকফ করলাম। একে তুমি কবুল কর। তাঁর মনে ছিল, ছেলে যেন হয়। তাইতো ওয়াকফ করা যাবে। কিন্তু যখন সন্তান জন্ম নিল তখন দেখা গেল, মেয়ে হয়েছে। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমি তো কন্যা প্রসব করেছি! আল্লাহ্ বললেন, তোমার ধারণায় যেমন ছেলে ছিল, এ মেয়ে তার চাইতে উত্তম। দেখুন হযরত মরিয়ম কেমন উত্তম মা ছিলেন! হযরত যাকারিয়া (আঃ) তাঁর পবিত্রতা ও নেকী দেখে অভিভূত হন। তদুপরি হযরত ঈসা (আঃ)-এর জননী হ'বার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সর্বোপরি আমাদের নবীজীকে দেখুন। একটি মাত্র কন্যাই জীবিত ছিল। যার মাধ্যমে সৈয়্যদ নামী বংশ অদ্যবধি আছে। আমাদের খলীফার চার মেয়ে। আবার এম এম আহমদ সাহেব নিঃসন্তান। এদের সংসারে কি কোন বিপর্যয় ঘটেছে। অবশ্যই না। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে যারা সংশয়মুক্ত নয়, তারা অজ্ঞতার পথকে শ্রেয় মনে করে। যেখানে কুরআন বলে, আর যখন তাদেরকে কন্যা জন্ম হবার সংবাদ দেয়া হয় তখন তাদের মুখ লজ্জায় কাল হয়ে পড়ে। তারা ভাবে, তথাকথিত লজ্জা সংবরণ করবে না নবজাতককে মাটিতে প্রোথিত করবে। তাই বলছি, কন্যা জন্মের কারণে যদি কোন মাকে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা দেয়া হয় তবে তা অতি মুর্খতা বৈ আর কিছুই নয়।

আমি এখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'র Islam's Response to Contemporary issues হ'তে কিছু কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিব "বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠানাদি গরীব ও ধনী পরিবারগুলোর মাঝে যে পদ্ধতিতে উদযাপিত হয়ে থাকে তা রীতিমত এক স্পর্শকাতর ব্যাপার। ব্যবধানটা এত বিরাট যে, এতে যে সব গরীব পিতামাতার ঘরে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে তাদের জন্য ব্যাপারটা ভয়ানক উৎকণ্ঠা ও অন্তর্জালার কারণ না হয়ে পারে না"।

প্রচুর ব্যয়বহুল বিবাহোৎসব, জাঁকজমক, ধুমধাম, ফুটানি, বড়লোকী দেখানো প্রভৃতি সব কিছুকেই ইসলাম নিন্দা করে।

নিকাহ্‌র ঘোষণা করা হয় সাধারণতঃ মসজিদে অনেক লোকের উপস্থিতিতে যেখানে ধনী-দরিদ্র সকলেই এক সাথে সমবেত হয়। মসজিদ তো আর ধুমধাম বা জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনীর জায়গা নয়। মসজিদ ইবাদতের স্থান আনন্দ ও খুশী প্রকাশের জন্য বিবাহের দাওয়াত বা ওলীমার ব্যাপারে বিত্তশালীদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। যে অনুষ্ঠানে গরীবদিগকে দাওয়াত করা হয় না, তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে অভিশপ্ত।

"পানাহার কর, কিন্তু সীমালঙ্ঘন বা অপব্যয় করো না। কারণ তিনি সীমা লঙ্ঘনকারীকে ভালবাসেন না" (সূরা আ'রাফ ঃ ৩২)।

পাকিস্তানের এক বিবাহে লাহোর হতে করাচী পর্যন্ত মেহেদী উৎসবে পুরো জাহাজ চার্টার্ড করা হয়েছিল।

কুরআন শরীফে মোহরানার কথা বলা হয়েছে এবং বিয়ের এলানের সময় এর উল্লেখ্য হয় বটে, তবে তা আদায়ের ব্যাপারে শিথিলতাই নয় বরং অনেকক্ষেত্রে আদায়ই হয় না। আমার অভিজ্ঞতায় এমন একটি ঘটনা আছে। একটি যুবক মা-বাপের ইচ্ছা ছাড়াই নিজের ইচ্ছায় খুবই বাসনা নিয়ে বিয়ে করে কয়েকদিন ধুমধাম করে। একটি সন্তান হবার পর সম্পর্কে ফাটল ধরে। শেষে তালাক হয়। আমি বল্লাম, মোহরানা আদায় কর। সে বলছিল, একবার Car দিয়েছি। একবার India ভ্রমণে গিয়েছি। অথচ Car তো পরিবারের উপভোগের জন্য। আর India সফরতো তাদের উভয়ের আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার ছিল। সুতরাং তাকওয়ার অভাব থাকলে এ পৃথিবীতে ধোঁকা দেয়াটা খুবই সহজ। তবে পরকালের ভাগ্য কে খন্ডাবে?

মুসলমানদের মাঝে বর্তমানে মেয়েদেরকে ওয়ারীসের প্রাপ্য আদায় করার ব্যাপারে বহু শিথিলতা দেখা দেয়। বিশেষ করে জায়গা জমির ব্যাপারে তো দস্তুরমত মেয়েদেরকে ঠকানো হয়। জমিতে ভাগ দিবে না কারণ অন্য Family ভাগ নিবে। ফলে খুবই লজ্জাকর ঘটনার সৃষ্টি হয়। সম্পত্তি ভাগ হবে, বলে ছোট ছোট ছেলেদের নিকট বড় ঘরের মেয়েকে বিয়ে দেয়া হয়। আমি মনে করেছিলাম, পাঞ্জাবেই এমন ঘটনা ঘটে। তবে আশ্চার্য হয়েছি, বাংগালী শিক্ষিত পরিবারেও এমন ঘটনা ঘটেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) খলীফা হবার পর পরই যে, কমিশনটি তিনি গঠন করেন তা হলো বিয়ে-শাদীর একটি নির্মম ঘটনা। একটি পরিবারের মজবুতির মাধ্যমেই একটি মজবুত সমাজ গড়ে উঠে।

বিয়ে-শাদীর ব্যাপারটি ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে। আর এতে সামাজিকতা বেশ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। অথচ ধর্ম অতি সহজ ও সরল পথের নির্দেশ করছে। কোন কোন সময় মানুষ বংশ তালাশ করে। কোন

কোন সময় ধন-দৌলত তালাশ করে। কোন কোন সময় রূপ ও সৈন্দর্যের জন্য এমনকি বংশ গৌরবের জন্য মেয়ে-ছেলের বিয়ে সময়মত দেয়া হয় না। ফলে শেষ পর্যন্ত গয়ের আহমদীতে বিয়ে হয়। এ ব্যাপারে আমি শুধু এটাই বলব, গয়ের আহমদীরা মুসলমান। কুরআন তো আহলে কিতাবদের সাথে বিয়ে জায়েয করেছে। তবে অসুবিধা দাঁড়ায় যে, পরিবারটি ক্রমশঃ তাদের নিজস্ব পরিচিতি ও সত্তাকে জড়িয়ে ফেলে। আর কোন কোন সময় ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি করে।

আমাদের জামাতের মজবুতির জন্য যেমন তাবলীগের দরকার তেমনি বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে খুবই সচেতন থাকা আবশ্যক। মানুষ প্রায় ক্ষেত্রে বিবাহযোগ্যা মেয়ের ব্যাপারে জামাতকে অবহিত করে। তবে বিবাহযোগ্য ছেলেদের ব্যাপারে নিজেই সর্দারী করাটা শ্রেয় বলে মনে করে।

পারিবারিক বিপর্যয়ের একটা দিক হলো Head of the family বিষয় সম্পত্তি বা টাকা-পয়সা জীবদ্দশায় আঁকড়িয়ে ধরে রাখে ভাগ-বাটোয়ারা করে না। নানা অজুহাত দেখায়। আর হঠাৎ হার্টফেল করে। তখন হিতাকাঙ্ক্ষীরা বলে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনেকক্ষেত্রেই মুসলমানরা নিজেদের অজ্ঞতার বোঝা খোদার উপর চাপিয়ে দিতে খুবই উস্তাদ সময় মত গৃহকর্তা যদি এগুলোর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সচেষ্ট হয় তবে পরিবারটি মহা বিপর্যয় থেকে মুক্তি পায়।

অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ নিজকে নির্দোষ মনে করে। নিজের মনকে সকল দোষ-ত্রুটিহীন ভাবে। নিজেকে জানাতো অনেক বড় কথা। নবীজী বলেছেন, নিজকে যে জেনেছে সে-ই তার রব্বকে জেনেছে। মানুষ তাই অপরের দোষ-ত্রুটি বের করতে পটু। হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, হে কপটগণ! তোমরা তোমাদের ভাইয়ের চোখের ধূলিকণা দেখতে পাও অথচ নিজের চোখের কড়িকাঠ দেখ না। নিজের চোখের কড়িকাঠ পরিষ্কার না করলে অপরের চোখের ধূলিকণা দূর করবে কীভাবে।

এ কারণেই কুরআনে মূসা (আঃ) তার জাতিকে বলেছেন, নিজের আত্মার সংশোধন কর। যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে ফেরা কালে আঁ হযরত (সঃ) বলেছিলেন, আমরা ছোট জেহাদ হতে বড় জেহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম। এ কারণেই দেখবেন আত্মহত্যার চেয়ে কতল বেশি সংঘটিত হয়। আর খলীফাতুল মসীহ্ তার খুতবায় বলেছেন, আমি যখন সংশোধনের কথা বলি, তখন একে অপরের দিকে আড়চোখে দেখে অথচ নিজের নফসকে দেখাই কর্তব্য ছিল।

সমাজে থাকতে গেলে একে অপরের সাহায্য ও সহায়তার দরকার হয়। এক্ষেত্রে টাকা-পয়সা লেন-দেন বা ধার করার প্রয়োজন হয়। যে ধার দেয় তার জন্য নবীজী উৎসাহজনক কথা বলেছেন, আবার যে কর্জ আদায় করে না তার জন্য কঠোর কথা বলেছেন, এমনকি তার জানাযাও পড়ান নি। কুরআন মাজীদের সূরা বাকারার ২৮৩-২৮৪ আয়াতে স্পষ্ট আছে, লেনদেন ছোট হোক বা বড় তা লিখে রাখবে। অনেক ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ রূপেই উদাসীন ও অবহেলা করা হয়। ফলে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। আর যে মার খাচ্ছে সে শেষে জামাতের দারস্থ হয়। তবে কোন কিছু লেখা না থাকার কারণে জামাতের পক্ষে মীমাংসা করা কঠিন হয়। আবার প্রাথমিক অবস্থায় ঝগড়ার ফলে, যে আবর্জনার সৃষ্টি হয় সেগুলো পরিষ্কার করতে অযথা সময় নষ্ট হয়। মনে রাখতে হবে, আমরা ইসলামের পারিবারিক জীবন বা সমাজের কথা বলছি। তাই ইসলামকে না জানলে বিপর্যয়ের মধ্যেই হাবুডুবু খেতে থাকবে। তখন শুধু নামেরই আহমদী থাকব। আর আল্লাহ্‌র সাহায্যও সেরূপই লাভ করব। যাক বলছিলাম দেনা-পাওনার কথা। আপনি যখন নিজের প্রয়োজনে টাকা কর্জ নেন তখন এক সঙ্গে নিলেন। অথচ আদায় করলেন দশ, বিশ টাকা করে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেল, ফেরৎ দেবার নামই নেই। নিজের প্রয়োজন মিটাচ্ছে ঘর তৈরী হচ্ছে। অথচ কর্জ আদায় হচ্ছে না। কারণ প্রয়োজন শেষ হচ্ছে না। প্রয়োজনের শেষও নেই। কুরআন বলছে, 'মৃত্যু পর্যন্ত সাধ মেটে না।' মানব প্রবৃত্তির চাহিদা সম্পর্কে নবীজী নকশা এঁকে দেখিয়েছিলেন। দুনিয়াতে থাকাকালীন প্রয়োজনীয়তার আর শেষ নেই।

এখন আমি পবিত্র কুরআনের সূরা লোকমান হতে কয়েকটি জরুরী বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। তার আগেই একটি দোয়ার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সূরা ফুরকানে এ দোয়া আছে ঃ রব্বানা হাবলানা মিন আজওয়া যিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা ওয়া কুররতা আইওনিন ওয়া জাআলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা-

জামাতে আহমদীয়ার একজন দক্ষ আইনজীবী ছিলেন লায়ালপুরের সাবেক আমীর হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার। তিনি Arabic is the source of all language বইটি লেখেন, যার Source ছিল হযরত মসীহ্ মাওউদের (আঃ) গ্রন্থ মিনানুর রহমান। তাঁর বইটি পন্ডিত মহলে খ্যাতি অর্জন করেছে এবং মিশরের আলেমগণ ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেহ্ (রাহেঃ) যখন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে জামাতে আহমদীয়ার বক্তব্য পেশ করার জন্য গিয়েছিলেন তখন হযরত শেখ সাহেবকে তিনি আইন উপদেষ্টা হিসাবে নিয়েছিলেন। তাঁর বীরত্ব ও সাহসের একটি ঘটনা সম্ভবতঃ আপনাদের জন্য পথ-নির্দেশক হবে। একবার লায়ালপুরে জামাতের তীব্র বিরোধিতা এবং হুমকী শুরু হয়; এমনকি শত্রুরা সরকারকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করে। উপস্থিত সরকারী কর্মচারীগণ শেখ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, এমন একটা পরিস্থিতিতে আপনি যে অবচিল। একটুও বিমর্ষ বা মুষড়ে পড়ছেন না, ব্যাপার কী? উত্তরে তিনি কি বলেছিলেন, "গভীর রাতে যারা কাঁদে তারা সরকারের কাছে অবশ্যই কাঁদবে না"।

যাক আমি শেখ সাহেবের নিকট শুনেছি; তিনি 'কুররাতা আইওনিন' এর অর্থের স্বপক্ষে নবীজীর এ হাদীস পেশ করেছেন "আমার নয়নের শীতলতা হলো নামায।" আরো চাওয়া হয়েছে, মুত্তাকীদের নেতা। বিষয়টি এত গভীর ও ব্যাপক, এতে প্রচুর আনন্দের খোরাক আছে। আমাদের আবাসস্থল যেন কবর না হয় যেখানে নামায পড়া হয় না। এ কারণেই নবীজী বলেছেন, ঘরটির একাংশ যেন নামায ও যিক্‌রে ইলাহী দ্বারা জীবিত থাকে।

এ স্থলে আমি শিরক সম্পর্কে আলোচনা করছি না। যদিও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বয়াতের দশটি শর্তের মাঝে প্রথমেই শিরককে পরিহার করতে নিষেধ করেছেন। আমরা এক আল্লাহ্‌কে অবশ্যই মান্য করি। আবার বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট ভূত মনের মাঝে স্থান দেই। তাই কোন কোন সময় ঐশী সহায়তা হতে বঞ্চিত হয়ে থাকে। যা হোক বিষয়টি ইলমী। তাই এখানেই এর বিরতি করছি। এর পরেই মাতা-পিতার স্থান।

আমাদের ধর্মে মাতাপিতার স্থান অতি উচ্চে। আল্লাহ্‌র পরেই মাতাপিতার স্থান। যদিও ক্রমান্বয়ে এ বন্ধন শিথিল হয়ে আসছে। মানুষ ক্রমশঃ নব নব পদ্ধতিতে দ্রুত বাড়ছে। অথচ মাতাপিতার প্রতি যে কর্তব্য সে সম্পর্কে যথার্থ মর্যাদা দিচ্ছে না। গুটি কতকের ব্যাপারে স্বতন্ত্র। পশ্চিমা দেশবাসী যতই মডার্ন হবার জয়গান গাচ্ছে ততই তারা বড়দের বিষয়ে বহুগুণ দূরে সরে যাচ্ছে। আমার ছোট্টমণির সাথে একটি মেয়ে পড়ে। সে হিসাবে মেয়েটির মা-বাপের সাথে কোন কোন সময় টেলিফোনে কথা হয়। একবার তার সাথে Post office এ দেখা। সে কী যেন বিল Pay করতে এসেছিল। আমার হাতে চিঠি-পত্র দেখে বলল, বাংলাদেশের পত্র দেখছি। বল্লাম, মা আছেন আত্মীয়-স্বজনরা আছেন তাদেরকে লিখতে হয়। সে বল্ল, তোমরা অযথা খরচ করো। আমার মা-বাপ Melborne এ থাকেন। গত সতর বছর দেখা করি নি। তারা ভাল আছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী করে জানলে, ভাল আছে। সে বল্লো, প্রতিবেশী সেখানে কাজ করে সময় সময় তার সাথে দেখা হয়। সে খবর দেয়। মনে দুঃখ লাগল। ডিসেম্বরের শেষের দিকে যীশুর জন্মদিনে বা Easter Day তে কেউ কেউ মা বাপের সাথে মিলিত হয়। ডিনার খায়। আবার কোন কোন মা এতই দুর্ভাগা যে, একটা নববর্ষের কার্ড পাঠালেও তা ফিরে আসে, কারণ প্রাপক নেই। এমন বহু হতভাগা মা বাপ ও ছেলে-মেয়ে আছে যারা এ মনোহর জীবনের স্বাদ হতে বঞ্চিত। অবশ্য রাষ্ট্র তাদের দেখা-শুনা করে। কিন্তু মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি কে দিবে? বর্তমানে কোন মুসলমান গুরুজনকে সেবা করা অমর্যাদার ও অসম্মানজনক মনে করে। হযরত খলীফাতুল মসীহের (আইঃ) মতে গুরুজনকে রাষ্ট্রের হাতে ছেড়ে দেয়াটা একটা লজ্জার বিষয়। তিনি বলেন, গৃহের এবং পরিবারের মধ্যে একজন মুসলিম নারীর যে ভূমিকা, তা তার সন্তানগণ বড় হলেও শেষ হয় না। সে অতীতে যেমন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তদ্রূপ ভবিষ্যতের সঙ্গেও থাকে। মা তাদের দেখা - শুনার ব্যাপারে বড় ভূমিকা পালন করেন। তাদের সঙ্গ দেন Servant হিসাবে নয়, বরং মানবীয় সম্পর্কের এ স্বাভাবিক অনুভূতি নিয়ে। ফলে মা-বাপ নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, তারা বৃদ্ধ হলে এ সমাজ তাকে উৎখাত করবে না এবং পুরাতন বস্তু হিসাবে ফেলে দেবে না। অবশ্য প্রত্যেক সমাজেই কিছু না কিছু ব্যতিক্রম আছে। এমন মুসলিম পরিবারও আছে, যারা অতীতের বিষয়গুলোকে বিরক্তিকর ও বোঝাস্বরূপ মনে করে। বিশেষ করে যারা আধুনিক প্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত। এ প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা আমার মনে পড়ল ঃ

ঘটনা শুনে হয়তো কেউ হাসবেন তবে অনেকের চোখ অশ্রুসিক্তও হবে। একটা শিশু তার দাদার সাথে তার পিতার দুর্ব্যবহারে অস্বস্তিবোধ করত। প্রথমে সে লক্ষ্য করল, তার বাপ তার দাদাকে একটা ভাল রুম থেকে একটি কম আরামদায়ক কামরায় রাখল। ক্রমশঃ কামরা বদলাতে লাগল। অবশেষে চাকর-বাকরদের সাথে জায়গা দিল। একবার তার দাদা প্রচন্ড শীতের দরুন তার কষ্টের কথা বল্লো, কামরাটাতো ভীষণ ঠান্ডা। তা ছাড়া লেপ তোষকও নেই। তাই সে থাকবে কি করে। তখন সে ছিঁড়া ফাটা পুরানো কাপড় খুঁজতে লাগল। ছোট্ট ছেলেটি তার পিতাকে বল্লো, বাবাগো সব ছেঁড়া-ফাটা দাদাকে দিও না। কিছু আমার জন্য রেখে দিও। নতুবা তুমি যখন বৃদ্ধ হবে তখন তোমাকে কী দিব! বাচ্চাটার অসন্তোষের এ নির্দোষ প্রকাশের ভিতর ফুটে উঠেছে বর্তমান যমানার দুঃখ আর মর্মবেদনা।

পবিত্র কুরআনে এ উপদেশ দেয়া হয়েছে; "তোমার প্রভু এ ফয়সালা দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছেড়ে অপর কারো ইবাদত করবে না এবং মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন বা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমক দিবে না বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলবে। তুমি সমতার সাথে তাঁদের ওপরে বিনয়ের বাহু অবনত রাখবে আর দোয়া করবে; হে আমার প্রতিপালক, তুমি তাদের উভয়ের প্রতি সেরূপে রহম করো যেরূপে তারা আমাকে আমার শৈশবে প্রতিপালন করেছিলেন" (১৭ঃ২৪-২৫)।

কত মহৎ ও কত সুন্দর শিক্ষা! মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততির মাঝে একটা সুদৃঢ় সম্পর্ক ও বন্ধনের সৃষ্টি করেছে। পবিত্র কুরআন ও নবীজী মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধার জন্য পথনির্দেশ করেছেন। পবিত্র কুরআন মাতাপিতাকে যেমন সুউচ্চ আসন দান করেছেন, তেমনিই সাবধানও করেছেন। যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, তবে তাদের সে প্রতিবন্ধকতা পালন করবে না। তবে জাগতিক বিষয়ে তাদের খেদমত করবে এবং তাদের সাথে অবশ্যই সদ্ব্যবহার করতে হবে।

নেকী ক্ষুদ্র হোক বা বড় সবটাতেই লাভ। তবে পবিত্র কুরআন এমন দানকে কোন মূল্যই দেয় নি যার পেছনে কষ্ট বা অবজ্ঞার লেশ মাত্র আছে। তা কর্জ হোক বা দান হোক। আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা খোঁটা বা কষ্ট দিয়ে নিজেদের দানকে ব্যর্থ করো না"। দান ও করা হয়, আবার ভ্রুকুটিও দেখাচ্ছে। ফকিরকে ভাত বা চাল দিচ্ছে আবার মন সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং মুখ মন্ডলে বিরক্তির রেখা দেখতে পাওয়া যায়। যার খাতির দেয়া হচ্ছে, তার ওপর যদি সঠিক বিশ্বাস হয় তবে জানা উচিত তিনি হৃদয়ের অন্তঃস্থল দেখতে পান। তাকে ধোঁকা দেয়া অসম্ভব। এখন আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি তার আলোকে বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে অতি সংক্ষেপে দু'একটি কথা বলব ঃ

হযরত নবী করীম (সঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ কাফিরদের বেলায় কঠোর অথচ পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত। কাফিরদের বেলায় কঠোর বলতে আমি বুঝি তাদের অপকর্ম যা পরিত্যাগ করে মুসলমান হয়েছিলেন। যে নোংরা ও ঘৃণামূলক কাজ ছাড়ার জন্য আমরা বয়াত করেছি, যদি তার পুনরাবৃত্তিই ঘটে তবে প্রেম -প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের সংঘ এবং বিশ্ব সংগঠনের যে স্বপ্ন তা ব্যর্থ হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইসলামী নীতি দর্শনে বলেছেন, নেকী দু'প্রকারের। মন্দ পরিহার ও পরোপকার করা। এ বিষয়ে বয়াতের শর্তাবলী, কিশ্‌তিয়ে নূহ এবং জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে একজন আদর্শ আহমদী সংকলনটি প্রতি ঘরে নিয়মিত চর্চা অব্যাহত রাখলে খুবই উপকৃত হবে বলে মনে হয়। আল্লাহ্ আমাদিগকে সুমতি দান করুন। (৬-২-২০০৩ তারিখ বাংলাদেশ ন্যাশনাল সালানা জলসায় পঠিত বক্তব্য)।

- মাওলানা মাহমুদ আহমদ
আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ অষ্ট্রেলিয়া জামাত

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(৩২তম কিস্তি)

কুদৃষ্টি থেকে সুরক্ষার দোয়া

□ হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন। নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান (রাঃ) ও হুসায়েন (রাঃ)-এর ওপরে ফুঁ দিতেন আর বলতেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজ পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও হযরত ইসহাক (আঃ)-এর জন্যে এ কথা দ্বারা ঐশী আশ্রয় চাইতেন ঃ

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّهَامَّةٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَّامَّةٍ۔ (بخاری کتاب الانبیاء)

(আ'উযু বিকালিমাতিল্লাহি তাম্মাতি মিন কুল্লি শায়ত্বানিন ওয়া হাম্মাতিঁওয়া মিন কুল্লি 'আইনিল্লাম্মাতি - বুখারী কিতাবুল আম্বিয়া)

অর্থ ঃ আমি সর্বপ্রকার শয়তান, জীব-জন্তু ও কু-দৃষ্টি থেকে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কথার আশ্রয় চাচ্ছি।

□ হযরত আমের বিন রবি'আহ্ বর্ণনা করেন। তার এক সঙ্গীর ওপরে দৃষ্টির প্রভাব পড়লে রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ দোয়ায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبْ حَرَّهَاوَبَرْدَهَا وَ وَصَبَهَا۔

(مسند احمد مطبوعہ بیروت جلد ۳ صفحہ ۴۴۷)

আল্লাহুম্মা আয্‌হিব হার্‌রাহা ওয়া বারদাহা ওয়া ওয়াসাবাহা - মুসনাদ আহমদ, বৈরুতে মুদ্রিত, ৩খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৭)।

অর্থ ঃ (আল্লাহ্‌র নামে ফুঁ দিচ্ছি) হে আল্লাহ্! এথেকে প্রত্যেক প্রকারের কুপ্রভাব, গরম বা ঠান্ডা দূর করে দাও। আর তাকে এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও।

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দোয়া

□ হযরত আব্দুর রহমান বিন আবী বকর (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন- বিপদগ্রস্ত লোকদের এ দোয়া করা উচিত ঃ

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ ، فَلَا تَكِلْنِیْ اِلٰی نَفْسِیْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَاَصْلِحْ لِیْ شَانِیْ كُلَّهٗ ، لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ۔

(ابوداؤد کتاب الادب)

(আল্লাহুম্মা রহ্‌মাতাকা আরজূ- ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বরফাতা 'আইনি-ওয়া আসলিহ্ লী শানী কুল্লাহূ-লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা - আবূ দাউদ, কিতাবুল্ আদব)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কৃপার প্রত্যাশী। সুতরাং তুমি এক মুহূর্তের জন্যেও আমাকে আমার কুপ্রবৃত্তির অধীনে ছেড়ে দিও না। আমার সব কাজ সমাধা করে দাও। তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ বা উপাস্য নেই।

দুঃখ-কষ্টে নিপতিত ব্যক্তিকে দেখে দোয়া

□ হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। যে ব্যক্তি কোন দুঃখ-কষ্টে নিপতিত ব্যক্তিকে দেখলে এ দোয়া করে তাকে এ দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করা হবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ ، وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا۔ (ترمذی کتاب الدعوات)

(আল্ হামদুলিল্লাহিল্লাযী 'আফানী মিম্মাবতালাকা বিহী-ওয়া ফায্‌যালানী 'আলা কাছীরিম্মিম্মান খলাক্বা তাফযীলা - তিরমিযী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে এ দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তোমাকে নিপতিত করা হয়েছে আর আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপরে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে।

পরীক্ষার সময়ের দোয়া

□ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন। হযরত রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম কোন কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হলে এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ ،وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، وَسُوْءِ الْقَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ۔ (بخاری کتاب الدعوات)

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন জাহ্‌দিল বালাই- ওয়া দারকিশ্ শাক্বাই-ওয়া সূইল ক্বযাই-ওয়া শামাতাতিল আ'দাই - বুখারী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি পরীক্ষার সংকট থেকে, দুর্ভাগ্যের করাল গ্রাস থেকে, তকদীর বা অমোঘ নিয়তির অনিষ্ট থেকে আর শত্রুর হাসি-ঠাট্টা থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।

দুঃখ-কষ্ট ও সংকটাপন্ন অবস্থায় দোয়া

□ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন। রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম দুঃখ-কষ্টের ভুবনে এ বাক্যগুলো আওড়াতেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ،لَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ،لَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ رَبُّ الْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ۔ (بخاری کتاب الدعوات)

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল 'আযীমুল হালীম-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল 'আরশিল 'আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুস্ সামাওয়াতি ওয়া রব্বুল আরযিলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু রব্বুল 'আরশিল কারীম- বুখারী, কিতাবুদ্ দা'ওয়াত)।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি মহান ও সহিষ্ণু। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি মহান আরশের প্রভু। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালক। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি আরশে করীমের প্রভু। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বাংলা সন মূলত হিজরী সন

আমাদের বাংলা সনের জন্ম বাংলার মাটিতে হয় নি। এর জন্ম দিল্লী নগরীতে। এর জন্ম দাতারা সবাই অবাঙ্গালী।

হিজরী সন সমগ্র আরব এলাকা, উত্তর আফ্রিকা, পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশ এবং মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশেও প্রচলিত। বর্তমানে খ্রীষ্টাব্দের প্রাধান্য হলেও সেসব অঞ্চলে হিজরী সন বিশেষভাবে প্রচলিত।

মহানবীর (সঃ) হিজরতের স্মরণে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে হযরত উমরের (রাঃ) পরামর্শে হিজরী সনের প্রবর্তন। এ সন চান্দ্র হিসাবে গণনা করা হয়। আদিকালে সব মাসই চাঁদের হিসাবে গণনা করা হ'ত। মাস এবং মাহ্ শব্দ দু'টির অর্থও হ'ল চাঁদ। ভারতীয়রা চাঁদের হিসাবে তাদের পূজা পার্বণের দিন-ক্ষণ নির্দ্ধারিত করত। অষ্টমী, দশমী, একাদশী এসবই চাঁদের হিসাবে। বৌদ্ধদের বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমাও চাঁদকে কেন্দ্র করে।

খ্রীষ্টানরা ইষ্টার ইত্যাদিও চাঁদের হিসাবে নির্দ্ধারণ করে।

অনেকে বলেন, চাঁদের হিসাব ইসলামী আর সূর্যের হিসাব ইসলামী নয়। কথাটি সঠিক নয়। চাঁদ এবং সূর্যের উভয় হিসাব ইসলাম সমর্থন করে। পবিত্র কুরআন বলে, **হুয়াল্লাযী জা'আলাশ শামসা যিয়াআঁ ওয়াল ক্বমারা নূরাঁওওয়া কাদ্দারাহুমানাযিলা লিতা'লামু আদাদাস্ সিনীনা ওয়াল হিসাব** (ইউনুস ঃ ৬ আয়াতাংশ) অর্থাৎ উজ্জ্বল সূর্য এবং আলোকিত চন্দ্রের গতি পথ নির্ধারিত করা হয়েছে যাতে এগুলোকে অবলম্বন করে বছর গণনা করা যায়। চন্দ্র এবং সূর্য দু'টি দিয়েই বর্ষ গণনা ইসলামে স্বীকৃত।

চাঁদ মুসলমানের কাছে উপাস্য নয়। বরং হিন্দুদের কাছে চন্দ্র স্বর্গের প্রতীক। মৃত ব্যক্তিদের নামের আগে স্বর্গীয় চিহ্নরূপে চন্দ্রবিন্দু অঙ্কিত করা হয়। 'ঔ' এর উপরে চন্দ্র বিন্দু দিয়ে ওঙ্কার উচ্চারণ করা হয়। প্রকৃত পক্ষে চন্দ্র ও সূর্য দু'টিই এক স্রষ্টার সৃষ্টি। জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্যবহৃত হয় এ চাঁদ ও সূর্য।

মুসলমানরা চাঁদ ও সূরুজ দু'টিকেই সমভাবে ব্যবহার করে থাকে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে। চাঁদ দেখে তারা রোযা রাখে, হজ্জ করে, ঈদ করে। আর সূর্যের হিসাবে রোযা ইফতার করে, নামাযের সময় নির্দ্ধারণ করে। অতএব চাঁদ সুরুজের ভেদাভেদ মুসলমানদের জন্য কাম্য নয়।

হিজরী চান্দ্র বছর ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ জুলাই থেকে গণনা শুরু হয়। মহানবী (সঃ) মক্কা থেকে মদীনায় পৌছেন ২০ সেপ্টেম্বর, ৬২২ তথা ৮ই রবিউল আওয়াল। ১লা মুহর্‌রম ছিল ১৬ জুলাই। তাই ১৬ জুলাই থেকে হিজরী সনের যাত্রা শুরু হয়। মুসলমানরা এ সনকে গ্রহণ করে দিনকাল হিসাব করতে থাকেন। মোগল বাদশারাও এ রীতি অনুসরণ করেন। চান্দ্র বছর হওয়ার কারণে প্রতি বছর দিন তারিখ ঠিক থাকত না। নববর্ষ কখন গ্রীস্ম আবার কখনও ঘুরে শীতে আসত। তাই খাজনা আদায়ের দিনকাল নির্ধারিত করা কঠিন হ'ত। তাছাড়া কৃষকরা যখন ফসল উঠায় সেই সময়টি চান্দ্র হিসাবে নানা মৌসুমে আসত। তাই বাদশাহ্ আকবর চান্দ্র বছরের পরিবর্তে সৌর বছর প্রবর্তন করার জন্য ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজীকে নির্দেশ দিলেন। **সিরাজী হিজরী সনকে ঠিক রেখে** সৌর হিসাবে চালু করলেন ১৫৫৬ সনের ১১ই এপ্রিল থেকে। ১৫৫৬ সালে হিজরী সন ছিল ৯৬৩। সিরাজী ঐ সনের রবিউস্‌সানী পর্যন্ত চান্দ্র হিসাব গণনা করে ১লা জমাদিউল আওয়াল থেকে সৌর হিসাবে গণনা শুরু করলেন। ভারতে প্রচলিত মাসগুলোকেই নূতন হিজরী সৌর সনের মাসরূপে গ্রহণ করলেন। এ মাসগুলো তারকার নামে পরিচিত। যেমন, অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কার্ত্তিকা থেকে কার্তিক, পুষ্যা থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, ফল্গুণী থেকে ফাল্গুণ, চিত্রা থেকে চৈত্র, বিশাখা থেকে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা থেকে জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ, ভাদ্রপদ থেকে ভাদ্র এবং মৃগজিরা থেকে মার্গশীষ, পরে এর নাম হয় অগ্রহায়ণ। অগ্রহায়ণ অর্থ বছরের প্রথম মাস। বারগুলোর নাম বিভিন্ন গ্রহের নামে। যেমন, মঙ্গল,বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ইত্যাদি। সোম ও রবিবার চন্দ্র ও সূর্যের নামে। আমাদের গণনায় যেমন চন্দ্র আছে তেমনি আছে সূর্য। আবার তারকা যেমন আছে তেমনি আছে বিভিন্ন গ্রহ। এমনটি আর কোন বর্ষ মাস, দিন গণনায় ব্যবহৃত হয় না।

৬২২ সালে ছিল ১ম চান্দ্র হিজরী সন। ১৫৫৬ সালে ৯৬৩ হিজরী চান্দ্র বছর। ৯৬৩ থেকে সৌর হিসাবে গণনা করে ২০০৩ সালে হয় ১৪১০ সৌর চান্দ্র হিজরী বা হিজরী কমরী শামসি। ৬২২ থেকে শুধু চান্দ্র হিসাবে হয় ১৪২৪ চান্দ্র বছর। ৬২২ থেকে এ সন যদি শুধু সৌর হিসাবে গণনা করা হয় তাহলে বর্তমানে হবে ১৩৮২ হিজরী শামসি। ভারত সরকার ১৩৬৪ সাল থেকে অর্থাৎ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ থেকে বাংলা বা হিজরী সন বাদ দিয়ে শকাব্দ চালু করে।

১৫৫৬ সালে ১৫ এপ্রিল ফসলী সন বা অধুনা বাংলা সন চালু হয় ১৪৭৮ শকাব্দের ১লা বৈশাখ। বাংলা একাডেমী ১৩৭৩ মোতাবেক ১৯৬৮ সন থেকে একটি সংশোধিত দিনপঞ্জী চালু করে। এতে মাসগুলো ছিল ৩১ ও ৩০ দিনে। পুরাতন পঞ্জীকায় ৩২ দিনেও সাল গণনা করা হত। ফলে আজো পশ্চিম বাংলায় আমাদের একদিন পর নববর্ষ পালন করে। এখানে এ-ও বলে রাখা দরকার যে, শুরুতে ১লা বৈশাখ ছিল ১১ এপ্রিল বর্তমানে ১লা বৈশাখ উদ্‌যাপিত হয় ১৪ এপ্রিল। এটিও ৩০, ৩১, ৩২শা মাঘ গণনার হের ফেরের ফল। হিজরী ফসলী সনটি বর্তমানে একমাত্র বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে। ফলে এ সনটিকে আমরা বাংলা সন বলি। বাংলা সন অর্থ বাংলাদেশে গৃহীত সন। উল্লেখ্য, হিজরী সন চালু হওয়ার পূর্বে আরবে আমুল ফিল বা হস্তী বছর চালু ছিল। ৫৭০ সালে আব্রাহা হস্তী বাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণ করতে এসেছিল। তাই এ মহা বিপদের কথা স্মরণ করে সে সময় থেকে হস্তী সন গণনা শুরু হয়।

হিজরী সৌর ও চান্দ্র সনই আজ আমাদের বাংলা সন। কারণ অবাঙ্গালীরা এ সনটিকে (চান্দ্র ও সৌর মিলিত) সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছে, আর বাংগালীরা তা সাদরে গ্রহণ করেছে। শুভ নববর্ষ বাংলা সন শুভ নববর্ষ হিজরী চান্দ্র ও সৌর সন।

- আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

কবিতা

সালাম জানাই দু'জনারে

নবীর নবী মহানবী তাঁর তরে হাজার সালাম
নবী সম্রাট বিশ্বনবী আহমদ মোহাম্মদ নাম
অতীতের সব নবীগণ উম্মত হওয়ার বাসনায়
প্রার্থনা করেছেন তাঁরা মহান প্রভুর দরগায়।
মহানবীর গোলামীতে আছে এমন মহাপদ
ইমাম মাহ্‌দী বলে তাঁকে এ উম্মতে সেই সম্পদ।
যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান মোহাম্মদের পুত্র আহমদ
শ্রেষ্ঠ গুরুর প্রধান শিষ্য বিশ্বমাঝে সেরা পদ।
জগত মাঝে বিরাজিত উম্মতি বুরুজী নবী
জীবন আদর্শে তিনি মহানবীর পূর্ণ ছবি।
নবী সিদ্দীক শহীদ সালেহ এ উম্মতের চারটি স্তর
ইমাম মাহ্‌দী লাভ করিলেন সেরা মকাম সবার'পর।
অন্তর থেকে সালাম জানাই পিতা-পুত্র দু'জনারে
সালাম সালাম হাজার সালাম রব উঠেছে এ সংসারে।

-আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

অনুশীলন

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বার্ষিক সম্মেলনে সমকালীন আলোচিত মানবাধিকার, নারী ও শিশু অধিকার, পরিবেশ অধিকার ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্যসহ সঠিক বক্তব্য উপস্থাপন করে জামাতের অগ্রণী অবস্থান নিশ্চিত করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন অষ্ট্রেলিয়া জামাতের আমীর মাওলানা মাহমুদ আহমদ। বিশ্ব আবহকালের হাজার হাজার ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ অনুদ্‌ঘাটিত, অনুচ্চারিত বা উচ্চারিত ইস্যুসমূহ সম্পর্কে নতুন চিন্তা-ভাবনায় মনোনিবিষ্ট হওয়ার সময় এখন।

খোদার প্রতিষ্ঠিত এ জামাতকে কালোত্তীর্ণ করতে হলে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার বিপরীত মন্তব্য উপস্থাপন করাই যথেষ্ট হচ্ছে না। সুশীল সমাজের কাছে সমসাময়িক বিষয়-বস্তু ঐতিহাসিক পটভূমিকায় যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে হবে। সহজাত জিজ্ঞাসু মনোবৃত্তিকে কষ্টি পাথরে যাচাই করে সত্যকে উপহার দিতে হবে। মানুষের আনন্দই মানুষের ইতিবাচক উপাদান।

সমকালীন বিশ্বে ধর্মীয় জগতে, দু'টি বিপরীত ধারা লক্ষ্যণীয়। একদিকে ধর্মের নামে পীর, দানব, জিন্ন, মনুষ্য পূজা, অন্ধ-বদ্ধ ধারণা, ধর্মের বেসাতি, কুপ্রথা, মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ, যুদ্ধ অন্যদিকে বিশ্বমানবতাবাদ, মানব অধিকার, পরিবেশ, নারী ও শিশুর অধিকার এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকরণ। ধর্মীয় জগতে এ দ্বিমুখী ধারার সাথে দ্বিমুখী চৈতন্যের লড়াই হচ্ছে বৈকি। বুদ্ধিজীবী সমাজেও কোন চেতনার ঐক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বুদ্ধিজীবীগণের নৈকট্যের অনুপস্থিতি প্রকট ও লক্ষ্যণীয়।

এক্ষেত্রে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) কর্তৃক রচিত Revelation Rationality Knowledge and Truth বইটি চৈতন্যের বিকাশ, মুক্তি ও ঐক্যের উপসংহার অংকণে সক্ষম হয়েছে। বইটির বিষয়বস্তু পটভূমি ও তথ্য এত সুনিপুন যে, সত্য যেন সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ, পদ্মরাগমণি। এ বইয়ে সমকালীন বিষয়বস্তুকে বিশ্লেষণ, যাচাই ও অনুসন্ধান করলে বিশাল সত্য নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে। তখন সত্যে অবগাহন করতে কেউ কুণ্ঠাবোধ করবে না। হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) বইটি শতাব্দীর বুদ্ধিজীবীগণের নিকট উপহার দিয়ে তাঁর বক্তব্য সমাপণ করেছেন, হয়েছেন দায়মুক্ত। তবে পথ-ভ্রান্ত অন্ধ পথিককে সত্যের পথে আনবে কারা? সকল জড়তা, ভ্রান্ত বিলাস ও অহংবোধ পরিহার করে কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে আমাদের। এ হলো সত্যের প্রতি ভালবাসার অগ্নি-পরীক্ষা।

আহ্‌মদী পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান বার্ষিক জলসায় 'ওয়াকফে নও' সম্পর্কিত বক্তব্যে মায়েদের প্রতি সন্তান পালনে যত্নশীল হ'তে বলেছেন। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মাতৃত্ব অনেক গভীরে সঞ্চারিত হয়েছে। অবহেলিত মাতৃত্ব যুগ-যুগান্তর পেরিয়ে অত্র যুগ অগ্রসরমান মাতৃত্বের আসন অলংকৃত করেছেন। স্বর্ণগর্ভা গর্ভধারিণী গড়িয়সী মাতৃত্বের প্রতি সম্মানসহ ভালবাসা প্রদর্শন যুগ সৃষ্টিতে পরিবৃত হতে না পারলে 'ওয়াকফে নও' পরিকল্পনার পরিপূর্ণতায় প্রসারিত হবে না।

তাই অনুচ্চারিত সন্তান জন্মদাত্রী মাতৃত্ব সম্পর্কীত বিষয়ে উল্লেখ এখন যুগের চাহিদাকে প্রসারিত করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে অত্র নিবন্ধক বিগত দিনের কুয়াশাচ্ছন্ন অভেদ্য ধারণার বিপরীত দৃশ্যমান সত্য উৎঘাটনে অনুসন্ধিৎসু সাহসী কলম সঞ্চালনে উৎসুক। মাতৃত্বের মহিমা কীর্তনের মধ্য দিয়ে যাত্রা হোক শুরু।

ঈদুল আযহিয়ার দিনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা সার্বজনীনভাবে বিধৃত হয়। মা হাজেরার কথা উচ্চারিত হয় কিঞ্চিৎ। মা হাজেরার আর্তনাদ কেন আপ্লুত করে না সাধারণ ভক্তবৃন্দকে? ইসলামকে এ নির্মাতা মা ইসমাঈল রূপেই নির্মাণ করেছিলেন। নবী সঙ্গীণী গর্ভ থেকে কৈশোর পর্যন্ত পুত্রকে তৈরী করেছিলেন বিনয়ী, নম্র, অনুগত, বিশ্বাসী এবং খোদার আশীর্বাদপুষ্ট হিসেবে। খোদার নির্দেশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন ইসমাঈলকে বিসর্জন দিতে নিয়ে যাচ্ছেন তখন হাজেরার অব্যক্ত কান্না ও হাহাকার অসহনীয়। বুকের ধনকে খোদা কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে পিতা জবাই করতে যাচ্ছেন এ দৃশ্য মায়ের কাছে কী নিদারুণ? পাথর নিস্তব্ধ শক্ত নির্বাক ভাবলেশহীন মা, কী নিষ্ঠুর ছবি! শুধু খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিসর্জন।

আবার উত্তপ্ত বালুকণায় আবৃত মক্কায় পিতা কর্তৃক বিসর্জিত ইসমাঈল ও হাজেরা। আকাশে সূর্যের তীব্র আগুন সদৃশ তাপ, খাদ্য ও পানি-হীন জীবন। আকুল কান্না মায়ের। তৃষ্ণার্ত পিপাসিত সন্তানকে পানি প্রদানের জন্য ছুটাছুটি করছেন মা। এখানে রহীম ও রহমান খোদার আগমন অবশ্যম্ভাবী। মায়ের নিদারুণ কষ্ট দাগ কাটে মনে। অনুভবে ভয়ে ভীত হই। কম্পিত হয় শরীর। যে মাঠের ফসল নিয়ে কৃষক বাসায় ফিরে, রেখে যায় শস্যহীন মাঠ, তারপর রৌদ্র এসে চৌচির করে দেয় মাটিকে। ঠিক তেমনি মাঠের মতই এ মা, শস্য-সন্তান ধারণ করেন, সুফলা হয় পৃথিবী ও মানব-সন্তান। কেউ দেখে না। অবহেলায় পরিত্যক্ত পৃথিবীর মতই শীতল নিন্দিত এ মাতৃত্ব।

মা হযরত আমিনার কথাই বলি। তাঁর বিবাহিত জীবন ছিল মাত্র কয়েক মাস। চব্বিশ বছরের যুবক আবদুল্লাহ্ স্ত্রীকে রেখে বাণিজ্যের লক্ষ্যে সিরিয়া রওনা হন। ফেরার পথে আবদুল্লাহ্‌র মৃত্যু হয়। এর এক মাস পর আমিনা জানতে পারেন তার স্বামীর মৃত্যুর খবর। কী নিদারুণ বৈধব্য জীবন! গর্ভ থেকে গর্ভোত্তর এবং পরবর্তী ছয় বছর প্রতিটি নিঃশ্বাসে পুত্র মুহাম্মদের (সঃ) প্রতি তাঁর ছিল ঐশ্বরিক অনুভূতি। মা আমিনাকেও ধর্ম ইতিহাসে সম্মুখভাগে নিয়ে আসা আমাদের কর্তব্য। মুহাম্মদ (সঃ) নামটি তারই দেয়া। মা আমিনা স্বপ্নে পেয়েছিলেন এ নামটি। পরবর্তীতে এ নামটি যুক্ত হয় আল্লাহ্ নামের সঙ্গে। সৃষ্টি হয় কলেমা শাহাদত।

মাতৃত্বের কল্যাণী রূপের বিকিরণ অনিয়ন্ত্রিত বিধায় স্যার জাফরউল্লাহ্ খানের 'মায়ের' বর্ণনা দেয়ার পূর্বে শ্রমিকের আস্তানায় পালিত ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা'র আলোচনায় আনা অযৌক্তিক হবে না। কোন তুলনা নয়- 'ওয়াকফে নও' সৃষ্টির লক্ষ্যে মাতৃত্বের ভূমিকাকে জাগরিত করার স্বার্থেই এ অবতরণিকা। জীবনের অগ্রভাবে স্রষ্টার অনুপম দৃশ্য মাতৃত্বের মধ্যে অবতীর্ণ না হলে সাচ্চা মা হওয়া যাবে না।

খোয়ার সদৃশ ঘরে মদ্যপ স্বামী কর্তৃক নির্লজ্জ ভাষায় অকথ্য গালাগালি ও লাথি খেয়ে খেয়ে যখন সারা দেহ ক্লান্ত, শ্রান্ত হয়েছে, যখন জীবনের সমস্ত রস শুষ্ক হয়ে শরীর বিষ জ্বালায় জ্বলে উঠেছে, যখন স্বামীর আদিম ভয়াল হিংস্র দৃষ্টি গরম লোহার শিকের মত বিদ্ধ করছে, তখনও মা তার সন্তানের ভবিষ্যতের আশায় জীবনে সুদূরের বাদ্য শুনছেন। মায়ের চোখের কী তীব্র দৃষ্টি! সন্তান মদ্যপ হলে মায়ের দৃষ্টিতে নিষেধাজ্ঞা প্রকাশিত হয়, আবার মাদকবর্জিত পুত্রের প্রতি স্নিগ্ধ হাসি জেগে উঠে। মায়ের

মুখের ভাষা ছেলেকে নিয়ে এসেছে পৃথিবীর বিপ্লবের যাত্রা পথে। পতিত সমাজ উত্তরণের ভাষা শিখেছে ছেলে পতিত শ্রমিকের আস্তানা থেকেই। ছেলে যখন কথা বলে গলিত পতিত সমাজ পরিবর্তনের ভাষা, মা কান দিয়ে শুনেন। পুত্রের বন্ধু-বান্ধবদের কথা ও আশা তার মনেও পরিবর্তনের ভাব জাগে। সে এক নতুন জীবন। প্রতিটি নিঃশ্বাসে ছেলের কথা ও তার বন্ধুদের কথা তার মাঝে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। তারপর অনেক কাল গত হয়েছে। বিপ্লবের চেতনা যখন জ্বালিয়ে দিয়েছে ছেলেরা, মা যোগ দিতে দ্বিধা করেন নি। পুত্র যখন শান্তিতে নির্বাসিত, তখন হাল ধরে মা লাফিয়ে পড়েন জীবন মৃত্যুর বিপ্লবে। সব ছুঁড়ে দিয়ে ডাক দেন বিপ্লবের। ততক্ষণে পুলিশ তাকে থেত্‌লিয়ে দিয়েছে। এ আমাদের মা! মাকে যদি সত্য, ন্যায় ও জীবন্ত খোদার প্রতি আকৃষ্ট করে রাখতে পারি তবে রাশিয়ার ধূলিকণাসম আহমদী দেখতে পারবেন- এ আশায় চেয়ে আছি।

মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'জননী' একটি সুন্দর লিরিক। শান্ত, ভংগুর বাংগালী পরিবারের 'মা'। শত দুঃখ-বেদনার মাঝে সন্তানের লেখাপড়ায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে প্রায় পাগলিনী। শত বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, দুঃখ-দারিদ্র তাকে হার মানাতে পারে নি। ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবেনই। না খেয়ে কতদিন কাটিয়েছেন, ছিন্ন-বস্ত্র পরিহিতা মা। সৃষ্টির বাস্তবতা, সৌন্দর্য ও ভবিষ্যত দেখেছিলেন মা ছেলের মাঝেই। ছেলের লেখাপড়ার পাঠ চুকার পূর্বেই চাকরী হলো। পৃথিবীর যাত্রা থামল না। পার্ল এস বার্ক অথবা শওকত ওসমানের 'মা' বইয়ের বক্তব্য সেই একই রকম। মাতৃত্ব বড় মনোহর সৃষ্টি! নিজেকে বিলিয়ে দেয়া এবং নব নব সৃষ্টিতে নীরবে যোগান দেয়াই তাঁর কাজ। মাতৃত্বের মাঝ থেকে স্বর্গীয় রূপ সংগ্রহ করে পৃথিবীর পথে সৎ সাহস নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প সৃষ্টি করতে হবে 'ওয়াকফে নও'দের।

মাতৃত্বের উপহারস্বরূপ খৃষ্টান জগৎ মাতা মরিয়মকে উপাসনাগারে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছেন অন্যতম খোদার আসনে। সূর্য, গাছ-গাছড়া, প্রতিমা, পৌত্তলিকার পূজো থেকে উত্তরণের যুগে এ মানব পূজোর আগমন হয়ত তখন অযৌক্তিক ছিল না। ভাবতে অবাক লাগে সাধারণ ধীবর সম্প্রদায়ের এক কুমারী সন্তান জন্ম দেয়াতে অকল্পনীয় অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করেছেন, কলংকের বোঝা নিয়ে, অনাহারে ছিন্ন বস্ত্রসমেত বাস অনুপযোগী কুঠিরে অবস্থান নিয়েছেন দীর্ঘদিন। সমাজ পরিত্যক্ত মা সন্তানকে অকাল মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছেন শুধু খোদার নূর দেখতে পেয়েছিলেন বলে।

স্যার জাফর উল্লাহ্ খান কর্তৃক স্বহস্তে বর্ণিত 'মা' পুস্তকে তাঁর মায়ের যে বাস্তব চিত্র প্রদর্শন করেছেন তা পড়লে পাঠকের মনে শিহরণ জাগে। কী আশ্চর্য ঐশ্বরিক আবরণে সাহসী, ধ্যানমগ্ন মা!

যুগে যুগে খোদা যখন খলীফা প্রত্যার্পণ করেন পৃথিবীতে, তখন খোদার নূরের উষ্ণতা বিকরিত হয়ে অনেক যোগ্য সন্তানের অন্তর - গহ্বরে প্রবেশ করে। মরহুম জাফরউল্লাহ্ খানের 'মা' এরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আত্মত্যাগ, আত্মসম্মান, সাহস, সহমর্মিতা ও বিশ্বাস খোদার প্রতি প্রথম নিবেদিত। এরপর অন্য কথা।

স্বামী, আত্মীয়-স্বজনের অনুমোদন ছাড়া শুধুমাত্র খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে বিসর্জন- এ এক বিরল বিস্ময়। এর কাছে সকাতরে মাথা নত হতে বাঁধা থাকে না। দোয়ার আচ্ছাদনে আবৃত মা সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন অতি সুনিপুনভাবে। পুত্রকে গড়ে তুলেছেন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনুষ্যরূপে। মসীহ্-এর পরিবারের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তুলনাহীন, আবার দরিদ্রদের প্রতি তাঁর মায়া অতুলনীয়। জগতের এ যুগ-সন্ধিক্ষণে সুশীল সমাজ মিথষ্ক্রিয়ার চৈতন্যের উত্তরণের জন্য এ মা'দের আমাদের প্রয়োজন খুব বেশি।

মাতৃত্বের প্রতি অবহেলা, অযত্ন একটি পাপ বিশেষ। বিধ্বস্ত সমাজ ব্যবস্থায় মাতৃত্বকে অতি সতর্কতায় আগলিয়ে রাখবে খোদা-ভীরু বিনম্র পিতৃত্ব। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে বর্তমান সভ্যতার সৃষ্টিতে মায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মা ও পৃথিবী একটি পরিপূরক উৎকর্ষ, স্বর্গীয় উপাদান। স্বর্ণগর্ভা পৃথিবীর গড়িয়সী এ মাতৃত্বকে উজ্জ্বল মহাকালের সাথে সমীকরণের দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠে। তারই মাঝ থেকে জাগ্রত হয় ভবিষ্যত আশ্বস্ত পৃথিবী।

প্রতিশ্রুত পৃথিবী দেখব বলে- বহু দুঃখের মাঝেও 'বুক বেঁধে আছি'।

- মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান

সুবক্তা হতে হলে

বক্তৃতা একটি আর্ট। একটি শিল্প। আদর্শ প্রচারের একটি শক্তিশালী কৌশল বা মাধ্যম। মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জীবন যাত্রার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বক্তব্য-বিবৃতি দিতে হয়। তাই প্রয়োজনের তাগিদেই বক্তব্য প্রদানের বিভিন্ন কলা-কৌশল আয়ত্ত করা উচিত। নিম্নে সুবক্তা হওয়ার কতিপয় টিপ্‌স তুলে ধরা হ'ল ঃ

পূর্ব প্রস্তুতি ঃ বক্তৃতা মঞ্চে যাওয়ার পূর্বেই বক্তাকে শারীরিক, মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। বক্তৃতার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় তথ্য, উদ্ধৃতি, রেফারেন্স, দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে নেয়া উচিত। আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহ নোট করে নেয়া যেতে পারে।

আকর্ষণীয় উপস্থিতি ঃ অহংকারীভাব পরিহার করে হাসিমুখে প্রফুল্ল মন নিয়ে সভাকক্ষে প্রবেশ করতে হবে। যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে শ্রোতা-দর্শকদের সাথে সালাম বিনিময় করতে হবে।

ছন্দময় গতিশীল উপস্থাপনা ঃ কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক রেখে চমৎকার বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। মনে রাখা উচিত শব্দ চয়ন, বাক্যের গঠনশৈলী, ভাষা ও উচ্চারণের উপরই আকর্ষণীয় উপস্থাপনা অনেকটা নির্ভরশীল।

সুবিন্যস্ত ও সুস্পষ্ট বক্তব্য ঃ বাহুল্য পরিহার করে তথ্যবহুল ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করতে হবে।

সহজ ও সাবলীল ভাষা ঃ বক্তব্য অবশ্যই সহজ, সাবলীল ও অর্থবহ হ'তে হবে।

বিশুদ্ধ উচ্চারণ ঃ উচ্চারণে বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সাধু, চলতির মিশ্রণ ও আঞ্চলিকতার টান পরিহার করে শুদ্ধ চলতি ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ঃ বক্তৃতার মঞ্চে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্যান্য বক্তা ও শ্রোতাদের দিকে লক্ষ্য রেখে বক্তব্য যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করতে হবে।

উপসংহার ঃ নির্দিষ্ট বক্তব্য শেষ করার পর অনুপম উপসংহার টানতে হবে। উপসংহারে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সার অংশ বা নির্যাসটুকু তুলে ধরতে হবে। শ্রোতাদের সম্মুখে গোটা বক্তৃতার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরতে হবে। সবশেষে দু'একটি আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় উদ্ধৃতি দিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করতে হবে।

এসব কলা-কৌশল অবলম্বন করলে যে কোন তরুণ-তরুণীর পক্ষে একজন সফল ও সুবক্তা হওয়া অনেকটা সহজ হবে।

- মাহমুদ ইউসুফ

(সৌজন্যে ঃ ইনকিলাব, ২৪/৩/২০০৩)

পর্দা প্রগতির দিশারী

(৯ম কিস্তি)

বিশ্ব-অবক্ষয় ও পর্দা

আধুনিক বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে চরম উৎকর্ষের দিকে ধাবিত। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলে মানব জীবন যাত্রায় যুগান্তকারী প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে, বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি মনের চিন্তাধারা জীবনের স্বপ্ন ও কল্পনায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে। আজ মানুষ গৃহকোণে বসে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সাথে অল্প সময়ে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে এবং পৃথিবী ও বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ পরিভ্রমণ করতে পারে। বিভিন্ন উন্নয়নের ছোঁয়ায় পৃথিবী যেন মানুষের হাতের মুঠোয় চলে আসছে। আধুনিক সভ্যতার বুনিয়াদ বিজ্ঞানেরই অবদান। আমরা বিজ্ঞানের সাগরে বাস করছি।

তাহলে কি জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় মানব জীবনের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পেয়েছে? বিজ্ঞানের উর্ধ্বগতির সাথে মানব জীবনের প্রশান্তি বেড়েছে? এর উত্তরে বলা যায় মানুষের দৈনন্দিন জীবন অনেক বিলাসবহুল ও আনন্দঘন হলেও প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজে সুখশান্তি বৃদ্ধি পায় নি। মানব মনের প্রশান্তি বাড়ে নি। অর্থাৎ জীবনে ভোগ বেড়েছে কিন্তু সুখ বাড়ে নি। মানবীয় প্রয়োজনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিহরণ জাগানো অগ্রগতির ফলে সামগ্রিক বস্তুগত উন্নতি হলেও মানুষের মাঝে নৈরাজ্য, অস্থিরতা, ভীতি-শঙ্কা ও ভবিষ্যতের প্রতি হতাশা বিরাজ করছে। বিজ্ঞান উন্নয়নের দিকে উর্ধ্বমুখী হলেও মানুষ অবক্ষয়ের করাল কবলে অধোগতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে অবাধ যৌনাচার, সন্ত্রাস, মারামারী, হানাহানী যুদ্ধ-বিগ্রহসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপে সারা পৃথিবী ছেয়ে গেছে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ "মানুষের হস্তসমূহ যা অর্জন করেছে তার ফলে স্থলে ও জলে ফাসাদ ছেয়ে গেছে" (আর রূম ঃ ৪২)।

মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে গঠিত উন্নতি লাভের পরও মানব দানবে পরিণত হওয়ার মূল কারণ- মানুষের নৈতিক চরিত্রের চরম অবনতি। সৃষ্টির প্রকৃতিপ্রদত্ত বিধান অনুসারে শ্রেষ্ঠ জীবের স্বকীয়তা বজায় রাখার জন্য একজন সুসভ্য মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যে সকল মনুষত্বের গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তা নেই। মনুষ্যত্বের কোমল বৃত্তিগুলো তার মনের গভীরে যে শুভ অনুভূতির সৃষ্টি করে মানুষ তা পালনে বিমুখ। মানব স্রষ্টা সৃষ্টির উদ্দেশ্য লাভের প্রেক্ষাপটে যুগে যুগে প্রেরিত মহা পুরুষের মাধ্যমে জীবন চলার যে দিক - নির্দেশনা দিয়েছে মানুষ তা থেকে লাইনচ্যুত। সদা প্রবৃত্তির মন্দ প্রভাবে ক্ষণিকের ভ্রান্ত স্বর্গ রাজ্যে বিরাজ করে এবং সুখ খোঁজে। ফলে সে নৈরাজ্যের করাল গ্রাসে পতিত হয়ে অবক্ষয়ে সর্বস্বান্ত ভগ্নচিত্তে অবিশ্রান্ত হয়ে ভ্রান্ত পথের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। ইউরোপ আমেরিকাসহ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিকতায় যে সকল দেশ যত বেশি উন্নত সে সকল দেশে অবক্ষয়ের বিষক্রিয়ার মাত্রা তত বেশি সংক্রামিত ও ব্যধিগ্রস্ত। আর তার বিষাক্ত বায়ুর কালো ধোঁয়া সারা পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করে ফেলছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় মানবতাকে অক্টোপাসের মত আঁকড়ে ধরেছে।

বিশ্বব্যাপী মানুষের নৈতিকতার চরম অবনতির অন্যতম কারণ সমাজের সর্বস্তরে সামাজিক, মানবিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের তীব্র অভাব। পাপাচার একটি অপরটিকে সংক্রামিত করে মানুষের চারিত্রিক মূল্যবোধের ভিত ভেঙ্গে ফেলছে। অবাধ যৌনাচারের ফলশ্রুতিতে দাম্পত্য জীবনে ভাঙ্গাগড়ার খেলা চলে। অনেকের কাছে বিয়ের বিষয়টি শুধুমাত্র যৌনভোগের নামান্তর। তাই তারা যৌন তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় একের পর এক সঙ্গী পরিবর্তন করে সুখ খোঁজে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের জীবনে সুখ সোনার হরিণ।

আবার অনেক জ্ঞান-পাপী আছেন তারা কাল মার্কস ও এঞ্জেল-এর সোসিয়েলিজম তত্ত্বের অনুসারী। সেই তত্ত্বের তাৎপর্য হ'ল, ধর্ম মানুষের শোষণের হাতিয়ার। তাই নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক বিবাহ বন্ধনে বেঁধে দেয়া এক ভয়ঙ্কর খেলা। এর ফলে সমাজে নারী-পুরুষ একে অপরের দ্বারা নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও শোষিত হয়। কাজেই বিবাহ বন্ধন পরিহার করে অবাধ যৌন-জীবন ও মানব প্রজন্ম আবশ্যক। নারীকে বহির্বিশ্বে পুরুষের সাথে সমান্তরাল কাজ করার সুযোগ দানের লক্ষ্যে তার উপর সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব না দিয়ে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সন্তান প্রতি পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এ সমাজ ব্যবস্থা মানুষকে তার মনুষ্যত্বের স্বকীয়তা নষ্ট করে পশুত্বে নিয়ে যায়। জীব - জন্তুর মত মানব জীবন কখনও কল্যাণ বয়ে আনে না। সমাজ উশৃঙ্খল, বিপর্যস্ত ও কলুষিত হয়। মানবতার অপমৃত্যু ঘটে। অনেক সমাজে নারীর গর্ভ ভাড়ার ন্যাক্কারজনক জঘন্য প্রথার প্রচলন আছে। তাতে নারীত্বের মর্যাদা ও অধিকার বিনষ্ট হয়। তারা পঙ্কিল জীবন যাপন করে। এটা সিগমন্ড ফ্রয়েড-এর অবাধ যৌন জীবনের সামাজিক রূপ রেখা।

তাদের সন্তানরা যেমন মাতা-পিতার স্নেহ ও ভালবাসা হতে বঞ্চিত হয় তেমনি মাতাপিতার ভাগ্যেও সন্তানের ভক্তি শ্রদ্ধা ও সেবা-যত্ন জুটে না। মাতাপিতা সন্তানকে সুশিক্ষায় সুসভ্য উত্তম চরিত্রবান মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন না করার কারণে তাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে অনেক অবহেলা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ভোগ করতে হয়। তাদের সমাজে পুরাতন অব্যবহৃত অকেজো যন্ত্র হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়। অনেক প্রৌঢ় সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রে পরিজন ব্যতীত একাকী নিঃসঙ্গ দুর্বিষহ ও মানবেতর জীবন যাপন করে। তারা জীবনের শেষ দিনগুলোতে হতাশা, অনুশোচনার মাঝে অতি দুঃখ-কষ্টে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ইহলোক ত্যাগ করে। অনেকে জীবনের জ্বালা মিটাতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। যারা যৌবনে বিলাসবহুল আড়ম্বর জীবন যাপন করেছে এবং পরিজন সমাজ ও রাষ্ট্রকে অনেক দিয়েছে, তাদের শেষ পরিণতি খুবই মর্মান্তিক ও হৃদয় বিদারক! (চলবে)

- মোঃ জাহাঙ্গীর বাবুল

ইসলামী সমাজে নারীর অবস্থান

যখনই ধর্ম-ভিত্তিক বা শরীয়তপন্থী কোনদল আন্দোলন করে প্রাধান্য লাভ করে তখন সর্বপ্রথম সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ ও শংকিত হয় নারী সমাজ। সমাজে ধর্মীয় ভাবধারার প্রথম পদক্ষেপই গৃহীত হয় নারীদের বিরুদ্ধে। মনে হয় তাদের উদ্দেশ্যই যেন নারী-বিদ্বেষ ও নারী-নির্যাতন। ইরান ও আফগানিস্তানের মত যে সমস্ত দেশ তথাকথিত ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রচলন করেছে ও নিজেদেরকে ইসলামী দেশ হিসাবে ঘোষণা দিয়েছে সেখানেই নারী সমাজ এক শোচনীয় অবস্থার শিকার হয়েছে। এ দু'দেশের নারীদের শিক্ষার অধিকার, চাকরী-বাকরী ও কাজ-কর্মের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার ইত্যাদি কেড়ে নেয়া হয়েছে ও নারীদের সকল কর্মকান্ড চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অস্বীকার করা হচ্ছে। বিভিন্ন মহল এর উদাহরণ দেখিয়ে মুসলমানদের শুধু সন্ত্রাসই নয় বরং ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নারী-বিদ্বেষী ও নারী নির্যাতনকারী হিসাবে প্রতীয়মান করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সমাজেও প্রগতিশীল নারী আন্দোলন ধর্ম ব্যবসায়ী মৌলবাদী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে চলছে। আফগানদের মত এরাও যেন নারীদের গৃহবন্দী ও নির্যাতিতই দেখতে আগ্রহী।

ইসলাম ধর্মে নারীর অবস্থান, তাঁর সম্মান ও অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে যা সকলের জন্যই কল্যাণকর ও গ্রহণযোগ্য। এ সম্বন্ধে সকলেরই সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত। ইসলামী সমাজের মূল ভিত্তিই হচ্ছে পরিবার এবং পরিবারকে কেন্দ্র করেই পুরুষ ও মহিলার অবস্থান ও কর্মকান্ড। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ **ওয়ালাহুন্না মিস্‌লুল্লাযী আলায়হিন্না বিল মা'রুফ** অর্থাৎ নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের (সূরা বাকারা ঃ ২২৮)। অর্থাৎ নারী শুধু গৃহকর্ম করে যাবে, সন্তানের ও পরিবারের জন্য প্রাণাতিপাত করে যাবে, অথচ তার কোন অধিকার থাকবে না, তা হবে না। সংসারে সকল কর্মকান্ডে নারীর যেমন দায়িত্ব আছে তেমনি সকল বিষয়ে (সম্পত্তির মালিক হওয়া থেকে সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ) তাঁর সমান অধিকার আছে। এর মাধ্যমে নারীকে তাঁর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ নারীকে তাঁর অবস্থান ও দায়িত্ব অনুযায়ী তাঁর অধিকার স্বীকৃত ও নিশ্চিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে পুরুষ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি স্ত্রীর চোখে ভাল সে-ই আল্লাহ্‌র চোখে যথার্থ ভাল লোক (আল্ হাদীস)। অর্থাৎ পুরুষের বিচারের ভার নারীর উপর। সে যদি নারীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে ও তাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারে তাহলেই সে সত্যিকার অর্থে ভাল বলে স্বীকৃতি পেতে পারে।

ইসলাম পুরুষকে পরিবারের অভিভাবক হিসাবে চিহ্নিত করেছে, শাসক বা পরিচালক নয়। অর্থাৎ পরিবারের ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পুরুষের বা পিতার। আর নারীর পদমর্যাদা মায়ের স্থানে, এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- **আল্ জান্নাতু তাহ্‌তা আকদামি উম্মাহাতুকুম** (আল্ হাদীস)। অর্থাৎ মায়ের পায়ের তলায় সন্তানের বেহেশ্‌ত। এ নির্দেশ দিয়ে নারীকে ভোগের সামগ্রীর অবস্থান থেকে তুলে এনে এক মহান মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে এ-ও বুঝান হয়েছে, নারীকে এ মর্যাদার যোগ্য হতে হবে, তাকে এমন গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে যার মাধ্যমে সংসারে ও সমাজে বেহেশ্‌ত রচিত হতে পারে।

পারিবারিক সম্প্রীতি ও বন্ধনের উপর জোর দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, বৈধ সকল কাজের মাঝে নিকৃষ্টতম হচ্ছে ত্বলাক অর্থাৎ ইসলামে যত কিছুর অনুমতি দেয়া হয়েছে তার মাঝে সবচাইতে অপসন্দনীয় বিষয় হচ্ছে বিবাহ-বিচ্ছেদ। আর যদি একান্তই নিরূপায় হয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে হয় তবে এ অধিকার কেবল পুরুষের একার নয় বরং ইসলামী শিক্ষানুযায়ী স্ত্রী-ও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার রাখে। ইসলামী পরিভাষায় একে 'খোলা' বলা হয়। ঐক্যবদ্ধ পারিবারিক জীবনই ইসলামী সমাজের আদর্শ।

মাতা-পিতাকে সম্মান দেখানোর বিষয়ে পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তাদের প্রতি এতটুকু কটূক্তি ও দুর্ব্যবহার করবে না যাতে তারা সামান্যতম কষ্ট পায় ও মুখ থেকে 'উহ্' শব্দ উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ পিতা-মাতার প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হওয়া প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। পিতামাতার প্রতি সহৃদয়তায় মায়ের দাবীই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। হাদীসে বর্ণিত আছে, 'এক ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, আমার পক্ষ থেকে সদাচরণের সবচাইতে বেশি দাবীদার কে? তিনবার এ প্রশ্নের উত্তরে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) তিনবারই বলেন, 'তোমার মা'। চতুর্থবারে তিনি প্রশ্নকারীর উত্তরে পিতার কথা উল্লেখ করেন। ইসলামে একথা স্পষ্ট করে বলা আছে যে, শিক্ষা লাভ বা জ্ঞান চর্চা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য সমানভাবে ফরয (অবশ্য করণীয়) অর্থাৎ মুসলিম সমাজে পুরুষের জন্য যতটা শিক্ষা লাভের সুযোগ-সুবিধা থাকবে এতটাই মেয়েদের ক্ষেত্রেও থাকতে হবে। এ স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মোল্লা সমাজ কেন যে নারী শিক্ষার বিরোধিতা করেন তা বোধগম্য নয়। এ দেশের মহিলারা বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মহিলারা যদি পুরুষের সমান হারে শিক্ষিত হতেন তাহলে সমাজের চিত্র অনেক বেশি উন্নয়নমুখী ও প্রগতিশীল হোত।

হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) যুদ্ধ যাত্রার সময় তাঁর স্ত্রী সহ মহিলাদের সঙ্গে নিতেন ইতিহাসে এরূপ বর্ণনা আছে। মহিলারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্যদের তৃষ্ণায় পানি দিয়েছেন ও আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করেছেন এমন প্রমাণও পাওয়া যায় অর্থাৎ ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের অনেক আগেই মুসলমান মহিলারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর তত্ত্বাবধানে আহতদের সেবা-শুশ্রূষার কাজ করেন। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে মহিলা সাহাবীদের সাহসিকতার কাহিনী ও ইসলামের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। অথচ আজকের কট্টরপন্থী মোল্লারা মহিলাদের গৃহবন্দী করে রাখতেই বেশি আগ্রহী। হাদীসে আরো নির্দেশ আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, ধর্মের অর্ধেক তোমরা আয়েশা (রাঃ)-এর কাছ থেকে শিখ। অর্থাৎ কোন কোন শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে মহিলাদের অধিকার অগ্রাহ্য। মোট কথা, বিশেষ বিশেষ কর্মে ও পেশায় যেমন নার্সিং বা সেবা স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা, শিক্ষকতা ও শিক্ষাবিষয়ক কর্মকান্ড, শিশু পালন ইত্যাদিতে মহিলাদের নিয়োগ ও সহযোগিতাকে ইসলাম ধর্ম বহুলভাবে উৎসাহিত করেছে। এসব থেকে প্রতীয়মান হয় ইসলামের সঠিক নির্দেশ মেনে চললে মহিলাগণ সমাজে যথাযথ মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে একথা স্পষ্ট, ইসলাম ধর্ম নারীদের গৃহবন্দী না রেখে তাদের মেধা ও যোগ্যতাকে সঠিক স্থানে ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করার শিক্ষা দান করেছে। এ শিক্ষাগুলো বাস্তবায়িত হলে তা যে নিশ্চিতভাবে দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

- মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব

ইসলামী সামাজিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে বিশ্বের প্রতিটি জনপদ ছিল চরম বিকারগ্রস্থ। মারামারী, হানাহানী, আর ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করাই ছিল সে যুগের মানুষের নিত্যদিনের কর্ম। সামাজিক অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, তখন রক্তের গন্ধ ব্যতীত মানবরূপী দানবেরা আরামে ঘুমাতে পারত না। পাষন্ড পিতা স্বীয় হস্তে পাথর নিক্ষেপ করে নিজ কন্যা সন্তানকে সুন্দর সবুজ-শ্যামল ঘেরা এ পৃথিবীর আলো-বাতাসের স্বাদ গ্রহণের বয়সে উপনীত হবার পূর্বেই হত্যা করেছে। জাহেলী যুগের বিত্তবান ব্যক্তিরা বিত্তহীন ব্যক্তিদের জীবনকে মূল্যহীন বলে মনে করত। অর্থ আর শক্তির বলে বিত্তহীনদের বংশপরম্পরায় চির গোলামীর জিঞ্জিরে বন্দী করে রাখা হতো। গোলামদের নিজস্ব কোন চাহিদা থাকত না। বিত্তবান মনিবের চাহিদা পুরণেই তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করে নিয়োজিত থাকতে হ'ত। মনিবের হুকুম পালন করতে গিয়ে সামান্য পান হতে চুন খসে পড়লেই চাবুকাঘাতে পিঠের চামড়া তুলে ফেলা হতো। হাতে পায়ে লোহার ডান্ডার বেড়ী পরিয়ে মরুভূমির প্রখর রৌদ্রে বুকে পাথর চাপিয়ে চিৎ করে দিনের পর দিন শুইয়ে রাখা হতো। অনেককে আবার পশুর ন্যায় কোমরে দড়ি বেঁধে বাজারে নিয়ে বিক্রি করে দেয়া হতো।

এমতাবস্থায় মানুষ-মানুষের ভেদা-ভেদ, ছোট আর বড়ের ব্যবধান গরীবের প্রতি ধনীর অত্যাচার চিরতরে রুদ্ধ করতেই ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে। মহান আল্লাহ্তাআলা বিশ্ব মানব সমাজকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলের সন্ধান প্রদান করতে যেয়ে গরীবের বন্ধু, ধনীর হিতসাধনকারী সৈয়্যদুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর প্রতি ওহী করলেন, "হে মানব সম্প্রদায়! নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হতে সৃষ্টি করেছি। এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক সম্মানিত, যে ব্যক্তি সর্বাধিক মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ববিদিত" (সূরা আল্ হুজরাত ঃ ১৪)

বিশ্ব-শান্তির প্রবক্তা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ) ঘোষণা করলেন, "হে লোক সকল! শ্রবণ কর, জাহেলি যুগের সর্বপ্রকার কুসংস্কার, সর্বপ্রকার অন্ধ-বিশ্বাস এবং সর্বপ্রকার অনাচার আজ আমার পদতলে দলিত-মথিত অর্থাৎ রহিত ও বাতিল হয়ে গেল। আল্লাহ্তাআলা তোমাদের জীবন ও তোমাদের সম্পদ একে অপরের হামলা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত পবিত্র ও নিরাপদ করে দিয়েছেন। হে লোক সকল! আমি তোমাদের যা বলছি, তা শোন এবং ভালভাবে মনে রাখ। প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই। তোমরা সবাই সমান। সব মানুষ তা তারা যে কোন জাতিরই হোক আর যে কোন ধর্মেরই হোক মানুষ হবার কারণে, পরস্পর সমান সম্মানের অধিকারী। যেভাবে দু'হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর সমান, সেভাবেই সকল মানুষ পরস্পর সমান।" "তোমাদের কোন অধিকার নেই যে, তোমরা একে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবী কর। তোমরা পরস্পর ভাই ভাই"। চাকর-চাকরানী বা দাস-দাসীগণের প্রতি মনিবদের নসীহত করতে যেয়ে হুযূর পাক (সঃ) বলেছেন, "তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ্তাআলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তোমাদের উচিত, তাদের তা-ই খেতে দেয়া যা তোমরা খাও। তাদের তা-ই পরতে দেয়া যা তোমরা পর এবং তাদের প্রতি এমন কর্মভার চাপাবে না যা তাদের সাধ্যের বাইরে। যদি তাদের উপর কখনো এমন কাজ চাপাও তবে অবশ্যই তোমরা সাহায্য করবে" (বুখারী)। জাহেলিয়তের সর্বপ্রকার অন্যায়-অনাচার আর বৈষম্যের বেড়াজাল ছিন্ন করে যেসব পুণ্যাত্মাগণ হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর মোবারক হস্তে দীক্ষা গ্রহণ করে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন, বতর্মান অশান্ত মুসলিম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপাদান হিসাবে তাদের মাঝে যে অসাধারণ প্রেম-প্রীতি মিল-মহব্বত মায়া-মমতা স্থাপিত হয়েছিল তা প্রকাশ করতেই প্রবন্ধের নামকরণ করা হয়েছে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব।

ইসলামের ইতিহাসে হযরত বেলাল এক স্মরণীয় নাম। হযরত বেলালের পিতা- মাতা ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ধৃত হয়ে মক্কাবাসীদের নিকট দাসরূপে বিক্রিত হন। তাই বেলাল (রাঃ) ছিলেন বংশানুক্রমে দাস। তিনি ছিলেন আফ্রিকান ঘোর-কৃষ্ণবর্ণের ক্রীতদাস। সে কালের সমাজে এ ধরনের কৃতদাসদের স্থান ছিল আস্তাবলে। হযরত বেলালের গায়ের রং কালো হলেও তাঁর ভিতরটা ছিল আলোকিত। এর কারণে মুহাম্মদী নূরের জ্যোতি তাঁর অন্তর সহজে উদ্ভাসিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। হযরত বেলালের ইসলামে দীক্ষিত হবার সংবাদ শুনে তাঁর মনিব নরাধম উমাইয়া অগ্নিশর্মা হয়ে নানারূপ নির্যাতন শুরু করে দেয়। সে আইন জারী করল, বেলাল আর মানুষের ন্যায় চলা ফিরা করতে পারবে না। নিকৃষ্ট পশুর ন্যায় তাঁর গলাতে রশি বেঁধে মক্কার উশৃঙ্খল বালকদের হাতে তুলে দেয়া হতো। নিষ্ঠুর বালকের দল হযরত বেলালের গলার রশি ধরে সমস্ত দিন মক্কার অলি -গলিতে হৈ-হৈ শব্দে তামাশা করে বেড়াত এবং টেনে হেঁচড়ে মেরে-পিটে আধমরা করে সন্ধায় উমাইয়ার বাড়ির সামনে ফেলে যেত। নরাধম উমাইয়া তখন হযরত বেলালের নিকট হাজির হয়ে বলত, এখানো সময় আছে ইসলাম ত্যাগ কর। আর মুহাম্মদকে সাবী বল। এ কথা শুনে তিনি ধীর স্থির কণ্ঠে পাঠ করতেন, আহাদ-আহাদ আহাদ। উমাইয়া এ দেখে অত্যাচারের মাত্রা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বাড়িয়ে মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য যখন এর প্রখর কিরণ বর্ষণ করে মরুভূমির বালু কণাকে আগুনে পোড়ানো লৌহ শলাকার ন্যায় উত্তপ্ত করে তুলতো সে সময় হযরত বেলালের হাত-পা বেঁধে চিৎ করে সেখানে শুইয়ে বুকের উপর পাথর চাপিয়ে রাখতো। হযরত বেলাল যখন পানি পিপাসায় কাতর হয়ে এক ফোঁটা পানির জন্য চিৎকার করতেন। উমাইয়া তখন জ্বলন্ত চুলা হতে টগবগ করে ফুটন্ত গরম পানি এনে জোড় করে তাঁর মুখে ঢেলে দিত। এতেও যখন বেলালের হৃদয় হতে আহাদ-আহাদ শব্দ মুছে ফেলা সম্ভব হলো না। উমাইয়া তখন তার আহার বন্ধ করে হাত পা বেঁধে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে ফেলে রাখত। ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির বেলালকে পিঠ মোড়া দিয়ে বেঁধে চাবুকাঘাতে পিঠের চামড়া ছিঁড়ে রক্ত ঝড়ানো হতো। হযরত বেলাল যখন উমাইয়ার নির্যাতনে মৃত্যু পথ যাত্রী, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) সাধারণ বাজার অপেক্ষা দ্বিগুণ মূল্যে

তাঁকে উমাইয়ার নিকট হতে ক্রয় করে স্বীয় গৃহে নিয়ে আসলেন। গৃহে এনে সেবাযত্ন করে তাঁকে সুস্থ করে তোলার পর বললেন, হে বেলাল! তুমি আজ হতে মুক্ত, তুমিও আমার ন্যায় স্বাধীন মানুষ। আমাতে তোমাতে কোন ভেদা-ভেদ নেই। তুমি ইচ্ছা করলে আমার এখানে অবস্থান করতে পার আবার ইচ্ছা করলে অন্যত্রও চলে যেতে পার। শুধু মুখের ঘোষণা দিয়েই হযরত আবূ বকর তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি, বরং তিনি ক্রীত দাস হাবশী গোলাম কৃষ্ণকায় বেলালের সাথে স্বীয় কন্যা হযরত রাবেয়াকে বিবাহ দিয়ে অসাধারণ সম্মানে ভূষিত করেছিলেন। পরবর্তীকালে হযরত উমর (রাঃ)-এর ন্যায় মহান খলীফার দরবারে তাঁকে সৈয়্যদনা হযরত বেলাল নামে সম্মান করা হতো। মক্কা কুরাইশদের অত্যাচার আর নির্যাতনের মাত্রা যখন সহ্যের সীমাতিক্রম করল তখন ঐশী নির্দেশে মুসলমানগণ পর্যায়ক্রমে মদীনাতে হিজরত করা আরম্ভ করলেন।

হিজরতের এক পর্যায়ে হযরত আইয়াশ ও হযরত হিশাম (রাঃ) আবূ জাহল তনয়দের হাতে বন্দীত্ব বরণ করে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। যে কারগারটি ছিল সুউচ্চ প্রাচীর ঘেরা ছাদবিহীন। যেখানে বন্দীদ্বয়কে আটকিয়ে ইসলাম ত্যাগের জন্য অসহনীয় নির্যাতন করা হতো। ছাদবিহীন কারাগারে প্রখর সূর্যের কিরণ, ভ্যাপসা গরম, অসহ্য ক্ষুধার যন্ত্রণা ও কাফিরদের নিষ্ঠুর চাবুকাঘাতে বন্দীদ্বয় যখন পরপারের পথ যাত্রী। তখন একদিন হুযূর (সঃ) উপস্থিত সাহাবাদিগকে বললেন, তোমাদের দু'ভাই মক্কায় কাফিরদের নির্যাতনে বর্তমানে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। তোমাদের মাঝে এমন কেউ আছে কি যিনি তাঁদের উদ্ধারের জন্য আত্মদানে প্রস্তুত। একথা শোনা মাত্র হযরত ওয়ালীদ (রাঃ) লাব্বায়েক বলে হুযূর (সঃ)-এর খেদমতে নিজকে পেশ করলেন, তিনি বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে বহু কষ্টে মক্কায় প্রবেশ করে বন্দীদ্বয়ের অনুসন্ধানে রত হলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর হযরত ওয়ালীদ (রাঃ) কারাগারটির সন্ধান পেলেন। তিনি অতি সংগোপনে কারাপ্রান্তরে উপনীত হয়ে সুউচ্চ প্রাচীর ডিংগিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। সেথায় প্রবেশ করে লক্ষ্য করলেন, বন্দীদ্বয়ের চরণে লৌহ ডান্ডার বেড়ী পরানো, এ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করা অসম্ভব। কিঞ্চিৎ চিন্তা করে কয়েদ খানাতে পড়ে থাকা একখন্ড শ্বেতপাথর তুলে এনে ডান্ডা বেড়ীর নীচে রেখে স্বীয় তরবারী দ্বারা আল্লাহু আকবর বলে সজোড়ে আঘাত হানলেন। এর ফলে ডান্ডাবেড়ী কেটে গেল। এবং হযরত ওয়ালীদ শত্রুর হস্তে ধরা পড়লে স্বীয় জীবনের ভয়াবহ পরিণতি জেনেও রাতের গভীর অন্ধকারে হযরত আইয়াশ ও হেশাম (রাঃ) সাথে নিয়ে মদীনা অভিমুখে রওনা হলেন।

মক্কার মুসলমানগণ স্বীয় ধন-দৌলত, বসত-বাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বস্ব পরিত্যাগ করে শুধু মাত্র মহান সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের অদম্য বাসনায় রিক্ত হস্তে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সর্বশেষে হুযূর পাক (সঃ) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হন। তিনি মদীনায় পৌছে মসজিদে নব্বীর নির্মাণ কাজ শেষ করে আনসার ও মুহাজিরগণের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ "নিশ্চয় মুসলমান পরস্পর ভাই-ভাই ব্যতীত আর কিছুই নয়।" এ মহান ঘোষণা শ্রবণ মাত্র আনসারগণের মাঝে আনন্দের বান ডেকে উঠল। প্রেম-মদিরা পান করে মুসলমানগণ মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। হুযূর পাক (সঃ) আনসারদিগকে ডেকে, মুহাজিরদিগকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করতে বললেন। হুযূর (সঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক আনসারগণ মুহাজিরগণকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করে স্বীয় জায়গা-জমি, ধন-সম্পদ ও ব্যবসায় বাণিজ্যের অংশিদারীত্ব প্রদান করেন। আনসারগণ মুহাজিরগণের সেবায় এমনভাবে নিয়োজিত করেছিলেন যে, তাদের অনেকেই হুযূর (সঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)! আমাদের মুহাজির ভাইদের অনেকেই স্ত্রীগণকে ছেড়ে আসাতে তাঁদের জীবন ধারণে কষ্ট হচ্ছে। আপনি অনুমতি দিলে আমাদের মাঝে যাদের একাধিক স্ত্রী রয়েছে, তারা একজনকে তালাক দিয়ে মুহাজির ভাইয়ের সাথে বিবাহ পড়িয়ে দিতে পারি। মুসলিমগণের সবাই ধনী ছিলেন এমনটি নয়। যাঁরা দরিদ্র ছিলেন তাঁরাও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উত্তম হতে উত্তম নমুনা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যেমন, একদা একজন ক্ষুধার্ত সাহাবী নবী করীম (সঃ)-এর নিকট হাজির হয়ে স্বীয় অবস্থা ব্যক্ত করলে, হুযূর (সঃ) নিজের গৃহে খবর নিয়ে জানতে পেলেন, গৃহে পানি ছাড়া অন্য কোন খাবার নেই। এমতাবস্থায় হুযূর পাক (সঃ) সাহাবাগণের মাঝে উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র একজন মেহমান আমাদের নিকট তার ক্ষুধার যন্ত্রণা ব্যক্ত করেছেন। হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! তোমাদের মাঝে কেউ তাকে গ্রহণে সক্ষম আছে কি? হযরত আবূ তালহা (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল (সঃ)! আমি তাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। হযরত আবূ তালহা (রাঃ) মেহমানকে নিয়ে স্বীয় গৃহে উপস্থিত হয়ে জানতে পেলেন, যে পরিমাণ খাবার রয়েছে, এ শুধু মাত্র তাঁর শিশু সন্তানদের পেট ভরার উপযুক্ত। হযরত তালহা ও তাঁর স্ত্রী সন্তানদের ভুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে মেহমানকে খাবার গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। মেহমান একা খাবার গ্রহণে রাজী না হওয়াতে আবূ তালহা ও তাঁর স্ত্রী বাতি নিবিয়ে দিয়ে মেহমানের সাথে খাদ্য গ্রহণের অভিনয় করে চললেন। আসমানের অধিপতি মহান আল্লাহ্‌তাআলা এ ঘটনায় এত বেশি খুশি হলেন যে, তিনি সে রাতেই হুযূর (সঃ)-এর প্রতি নাযিল করলেন, "এবং তারা নিজেদের দারিদ্র থাকা সত্ত্বেও তাদিগকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। এবং যাদেরকে তাদের আত্মার কৃপণতা হতে রক্ষা করা হয়, তারাই প্রকৃত সফলকাম।" হুযূর প্রত্যুষ মসজিদে উপস্থিত হয়ে হযরত আবূ তালহা (রাঃ)-কে বললেন, হে তালহা-তোমার মেহমানদারী খোদাতাআলা কবুল করেছেন।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ১৫ হিজরী সনে ইয়ারমুক নামক স্থানে রোমানদের সাথে মুসলমানগণের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। সেই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)। তিনি সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে চল্লিশটি ব্যাটালিয়ানে বিভক্ত করেন। সংরক্ষিত বাহিনীর গুরুভার ন্যস্ত হয় হযরত ইকরামা (রাঃ)-এর স্কন্ধে। উভয়পক্ষের প্রচন্ড আক্রমণের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীর দক্ষিণ অংশে দুর্বলতা দেখা দেয়। সেনাপতি উপলব্ধি করলেন, যে কোন মুহূর্তে রোমানদের আক্রমণের বিশাল বাহিনী এ মুসলিম বাহিনীর জীবন বিপন্ন করে যেতে পারে। তিনি কালক্ষেপণ না করে হযরত ইকরামা (রাঃ)-এর সংরক্ষিত বাহিনীকে তলব করলেন। হযরত ইকরামা (রাঃ) স্বীয় বাহিনীর চারশ' সৈন্যের নিকট হতে যুদ্ধে বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্যে মৃত্যুর অঙ্গীকার গ্রহণ

করলেন। সেনাপতির হুকুমে সবাই মরণপণ লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কয়েক মুহূর্তে মুসলিম সৈন্য দলের হারানো মনোবল ফিরে আসে। এবং এক পর্যায়ে রোমান বাহিনী পরাজয় বরণ করে। এ যুদ্ধে হযরত ইকরামা (রাঃ) সংরক্ষিত বাহিনীর সকল সদস্যই শাহাদতের পিয়ালা পান করেন। যুদ্ধ শেষে হযরত ইকরামা (রাঃ) যখন আহত অবস্থায় পানি পানি বলে কাতরাচ্ছিলেন। তখন কোন একজন তাঁর নিকট এক পিয়ালা পানি নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি নিজে পানি পান না করে তাঁর পরের জনের প্রতি ইশারা করে জানালেন, আমার অপেক্ষা তাঁর পানির প্রয়োজনটা অনেক বেশি। পানি পাত্র নিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট যাওয়া হলে, তিনিও বললেন, আমার রায় পরের জনের পানির প্রয়োজন বেশি। তাই পানিটুকু তাঁকেই পান করান। এমনিভাবে যাঁর নিকটই পানি নিয়ে যাওয়া হলো সবাই নিজের পরিবর্তে অন্যকে দেখিয়ে দিলেন। পানি নিয়ে সর্বশেষ ব্যক্তির নিকট গেলে তিনি বললেন, আপনি ভুল করেছেন। আমার জানামতে সর্বাপেক্ষা হযরত ইকরামাই বেশি আহত এবং আমাদের অপেক্ষা পানির প্রয়োজন তাঁরই বেশি। তাই পানির পাত্র নিয়ে দ্রুতগতিতে তাঁর নিকট ছুটে যান। পানির পিয়ালা নিয়ে, পানিওয়ালা দৌড়ে হযরত ইকরামা (রাঃ)-এর নিকট এসে দেখলেন তাঁর আর কোনদিন পানির প্রয়োজন হবে না। অনেক আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। এমনিভাবে পুনরায় পানির পিয়ালা হাতে যুদ্ধাহত প্রত্যেকের নিকট গিয়ে দেখা গেল, তাদের সবাই একে অপরের আগে পানি পান না করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। ইসলামের প্রথম যামানার মুসলিম মিল্লতের এ আজিমুশ্‌শান ভ্রাতৃত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআন করীমায় বলা হয়েছে, "এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে মজবুতভাবে ধারণ কর। এবং তোমরা একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ো না এবং স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে, যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে। তখন তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করলেন এবং তোমরা তাঁরই নিয়ামতের ফলে একে অপরের ভাই হয়ে গেলে। এবং তোমরা জাহান্নামের কিনারাতে দাঁড়িয়েছিলে, তখন তিনিই তোমাদিগকে উদ্ধার করলেন" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)।

খেলাফতে রাশেদা আল্লাহ্‌র রজ্জু হিসাবে স্বীকৃত। এর বিলুপ্তির সংঙ্গে সংগেই মুসলিম সমাজের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে ভাটা পরিলক্ষিত হতে থাকে। কাল-পরিক্রমায় অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়, এক সময় যে মুসলমান যুদ্ধাহত অবস্থায় একে অন্যের পূর্বে পানির পিয়ালা হস্তে ধারণ করার পরিবর্তে শাহাদাতের পিয়ালা পান করে জগত হতে চির-বিদায় গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অবর্তমানে তাঁদেরই উত্তরসূরীরা একে অপরের রক্তে অবগাহনে পরিতৃপ্তি লাভ করতে থাকে। কিন্তু জগত প্রভু, করুণা-সিন্ধু মহান রব্বুল আলামীন স্বীয় জগতটাতে শান্তির সর্বশেষ ধর্মমন্ডলী হিসাবে যে মুসলমানদেরকেই বেছে নিয়েছেন। তাই মুসলিম সমাজের সংঘাত আর হানাহানি বেশি দিন চলতে দিলে জগতটা নিঃসন্দেহে জাহান্নামে রূপান্তরিত হবে। এটা রহমান খোদার কাম্য নয় বিধায়, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক, **ওয়াআখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকূবিহিম** আয়াতে করীমার আলোকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর বুরুজ হিসাবে, ভারতের কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী হিসাবে প্রেরণ করে মুসলিম সমাজের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় ইসলামের দ্বিতীয় যামানাতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্বের বেশুমার দৃষ্টান্ত হতে শুধুমাত্র একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে ইতি টানছি।

গত শতকের ৩০ হতে ৪০ দশকের মধ্যভাগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার খড়মপুর গ্রামের দেশ বরেণ্য ব্যক্তিত্ব মরহুম জনাব কাজী খলিলুর রহমান খাদেম সাহেবের অসাধারণ ভদ্রতা, ধৈর্যের এবং দোয়ার কল্যাণে কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুরের খ্যাতনামা এ্যাডভোকেট মরহুম জনাব আনিসুর রহমান সাহেব বিরোধিতা পরিত্যাগ করে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে দাখিল হন। আহমদীয়তে দীক্ষিত হবার সাথে সাথেই যুগ-যুগান্তরের প্রথা মাফিক বিরোধিতার অণল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। কিন্তু জনাব এ্যাডভোকেট সাহেবের ব্যক্তিত্বের কারণে মোখালেফীনরা সফলতার চূড়ান্ত মার্গে উপনীত হতে পারল না। অবশেষে এলাকার মোল্লা-মৌলবীরা তাঁর বিরুদ্ধে জন সমাবেশ করে কাফিরের ফতওয়া দেয় এবং মেথরদেরকে জনাব এ্যাডভোকেট সাহেবের বাড়ি হ'তে মল পরিষ্কার করতে কঠোরভাবে বারণ করে দেয়। সেকালের শহরের পায়খানাতে মল ত্যাগ করার জন্য নীচে বড় গামলা জাতীয় কোন পাত্র রাখা হতো। সমস্ত দিনের পরিত্যক্ত মল রাতের আঁধারে মেথররা তুলে নিয়ে ফেলে দিত। মেথররা মোল্লাদের বাধার কারণে যখন জনাব মরহুম আনিসুর রহমানের বাড়ির মল পরিষ্কার করা বন্ধ করে দিল। তখন সমস্ত বাড়ী ও এলাকায় এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেল। কোনভাবেই এ সমস্যার সমাধান পাওয়া যাচ্ছিল না। মোল্লাদের এহেন জঘন্য ব্যবহারের সংবাদ কটিয়াদী জামাতের সদস্য সাবরেজিষ্ট্রার মরহুম জনাব আবুল হুসেন সাহেবের নিকট পৌছা মাত্রই তিনি বাজিতপুরে ছুটে যান এবং জনাব এ্যাডভোকেট সাহেবকে ধৈর্যের সাথে দোয়ার মাধ্যমে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে বলেন। পরের দিন সকালে এ্যাডভোকেট সাহেব লক্ষ্য করলেন, পায়খানাতে কোন মল নেই, কে বা কারা যেন তা তুলে নিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় কয়েক দিন চলার পর সমস্ত এলাকাতে এক চাপাগুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো। সাধারণ মানুষ ধারণা করতে থাকল যে, মেথররা যেহেতু এ্যাডভোকেট সাহেবের বাড়ির মল পরিষ্কার করছে না, তা হলে নিশ্চিয় কোন জিন্ন পরী এসে রাতের অন্ধকারে এ কাজটি করে মানুষকে লজ্জা দিচ্ছে। অপর দিকে মরহুম আনিসুর রহমান সাহেবের মনের মধ্যেও রহস্যের জাল বুনতে শুরু হলো, তিনি মনে করলেন, আল্লাহ্‌র কোন ফিরিশ্‌তা আমার এ বিপদের মুহূর্তে এভাবে সাহায্য করছেন। এ দেখতেই হবে। তিনি রাত জেগে পাহারা দেয়া শুরু করলেন। একরাতে দূর হতে লক্ষ্য করলেন, দু'জন মানুষ মুখ ঢাকা অবস্থায় পায়খানা হতে মল তুলে বালতিতে ঢেলে মাথায় নিয়ে যাচ্ছেন। জনাব আনিসুর রহমান সাহেব দ্রুতগতিতে তাদের সামনে রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে তাদের পরিচয় জানতে চেয়ে মুখের কাপড় তুলে যে দু'জন ফিরিশ্‌তার চেহারা মোবারক দর্শন করলেন এদের একজন কটিয়াদীর সাবরেজিষ্ট্রার জনাব মরহুম আবুল হুসেন, অপর জন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার তারুয়া গ্রাম হতে কটিয়াদীতে হিজরতকারী জনাব মরহুম মৌলভী শামসুজ্জামান সাহেব (মোয়াল্লেম)।

এদের চেহারা দর্শন মাত্র এ্যাডভোকেট সাহেব উভয়কে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কান্না শুরু করলেন। এ ঘটনায় হুযূর (সঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণী আমার উম্মত কীভাবে ধ্বংস হবে, যার প্রথমাংশে রয়েছি আমি আর শেষাংশে রয়েছেন প্রতিশ্রুত মাহ্দী (আঃ)" পুর্ণরূপে সত্যে পরিণত হলো। আহমদীয়ত গ্রহণের মূহূর্ত হতে অদ্যবধি জামাতে আহমদীয়ার সদস্যের মাঝে পরস্পরে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের যে উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে তা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করতে শত শত পৃষ্ঠা প্রয়োজন বিধায়, সংক্ষিপ্তভাবে শুধু বলতে চাই, আহমদীয়তের শতবর্ষ পরেও আমি দেখেছি, একজন বিপদগ্রস্ত বন্ধুর বিপদ নিরসনে উচ্চ পর্যায়ে হতে শুরু করে একজন দিনদরিদ্র ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই কীভাবে স্বীয়-ঘর-বাড়ী সহায়-সম্পত্তি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, চাকুরী-বাকরী এমনটি দিনমজুরী পরিত্যাগ করে অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় পাশে দাঁড়িয়েছে, স্বীয় অন্ন অপরকে দিয়ে অসংখ্য খোদার প্রেমিককে দেখেছি অনাহারে দিনাতিপাত করতে। সীমারের প্রেতাত্মারা যখন কোন আহমদীর পানি বন্ধ করছে তখন দেখেছি, বয়েসের ভারে নুইয়ে পড়া ব্যক্তিকে শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের বাসনাতে স্বর্গীয় স্কন্ধে কলসি বহন করে দূর-দূরান্তের গ্রামে পানি পৌছাতে। আজও আমার মানস - পটে জাগ্রত রয়েছে, খুলনা শহরের আহমদীয়া মসজিদে মানবরূপ দানবের পেতে রাখা বোমা বিস্ফোরণে শাহাদাত লাভকারী ও আঘাতে পঙ্গু হয়ে যাওয়া বন্ধুগণের মাগফিরাতের জন্যে মসজিদে মসজিদে সমবেত আহমদী মুসলিম জামাতের সদস্য বৃন্দের সেজদায় পতিত হয়ে খোদার রাহে কান্নার অপূর্ব দৃশ্য। সেদিনের কান্নায় বাংলার আকাশ-বাতাসে এক নতুন তরঙ্গমালা সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষের আহাজারী আর হৃদয় নিংরানো অশ্রুজলে খোদার আরশেও প্রকম্পন সৃষ্টি হয়েছিল। সেদিন বার বার মনে হচ্ছিল, আল্লাহ্র হাবীব নবীকুলের শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণী; মুসলমান পরস্পরে হাতের পঞ্চম আঙ্গুলের ন্যায়। যার একটিতে আঘাত লাগলে প্রতিটি আঙ্গুলই ব্যাথিত হয়। মরহুম মৌলবী সলিমুল্লাহ্ সাহেব ইসলামের দ্বিতীয় যুগের এ অপরূপ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে মোহিত হয়েই গেয়ে উঠেছিলেন! "যেদিন হতে দীক্ষা লহিনু ইমাম মাহ্দীর হাতে, ভুলেছি সহোদর ভাই, জেনেছি তোমায় আপন বলে"। আমি আমার প্রভুর নামে কসম করে বলছি, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগণের মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে ভ্রাতৃত্বের যে সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে এরই ফলে পুনরায় পবিত্র কুরআনের নিম্নে উল্লেখিত বাণীটি সত্যে পরিণত হয়েছে ঃ "মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল, এবং যারা তার সঙ্গে রয়েছে তারা কাফিরদের মোকাবেলাতে অত্যন্ত কঠোর কিন্তু পস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত। তুমি তাদিগকে রুকূ ও সেজদারত দেখতে পাবে, তারা সর্বদা আল্লাহ্র ফযল ও সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট থাকে। সেজদার চিহ্নের কারণে তাদের চেহারাতে তাদের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়" (সূরা আল্ ফাতাহ্ ঃ ৩০)।

- মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম
মোয়াল্লেম

সংবাদ

ক্রোড়া মজলিসের ওয়াকারে আমলের কয়েকটি রিপোর্ট

♦ ২০ ও ২১ মার্চ, ২০০৩ ক্রোড়া মজলিসের ৬ জন খাদেম ৩ কি.মি. দূর থেকে মোয়াল্লেম কোয়ার্টারের জন্য রড, বাঁশ, কাঠ আনয়ন করে।

♦ ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল ০৩ তারিখে ৫ হাজার ইট দূরবর্তী স্থান থেকে ২৫ জন খাদেম নির্মাণাধীন মোয়াল্লেম কোয়ার্টারের নিকট আনয়ন করে ওয়াকারে আমল পালন করে।

♦ ৪ এপ্রিল ২০০৩ ক্রোড়া মসজিদের নিকটবর্তী একটি সড়কের গর্ত ভরাট করে ওয়াকারে করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

- আফজালুর রহমান রিপন
কায়েদ

ওয়াকারে আমল

খোদ্দামুল আহমদীয়া, তেবাড়ীয়ার উদ্যোগে সমগ্র জামাত সম্মিলিতভাবে ঈদ উল আযহার প্রাক্কালে ৩দিন ব্যাপী বিশাল ওয়াকারে আমলের কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মসজিদের চারিদিক বাঁশ দিয়ে বাউন্ডারী দেয়া। এতে মোট ২০টি বাঁশের প্রয়োজন পড়েছে এবং এগুলো আহমদী ভাই বোনেরা মসজিদের কাজের জন্য দান করেছেন। এছাড়াও মসজিদের ভেতর ও মাঠ পরিষ্কার, কোরবানীর স্থান পরিষ্কার এবং সবশেষে মসজিদ সাজানো। এতে সার্বক্ষণিকভাবে ৮ জন খোদ্দাম, ৬ জন আনসার, ৭ জন আতফাল শারীরিক পরিশ্রম দিয়ে সাহায্য করেছে।

এ ওয়াকারে আমলের মাধ্যমে ৩০০০/= (তিন হাজার) টাকা স্বাশ্রয় হয়েছে কারণ ২০টি বাঁশের দাম প্রায় ২০০০/= টাকা।

- মোঃ মোহাইমিনুল ইসলাম
কায়েদ

M.T.A-এর সংযোগ প্রদান প্রসঙ্গে

♦মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তারুয়ার উদ্যোগে দশজন আহমদীর ঘরে M.T.A-এর সংযোগ দেয়া হয়। এতে M.T.A-এর দর্শক সংখ্যা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়।

সাপ্তাহিক তা'লীম ও তরবিয়তী সভা

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া তারুয়া উদ্যোগে সাপ্তাহিক তা'লীম ও তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব। এতে ১৫ জন খোদ্দাম, আতফাল ২৫ জন ও আনসার ২০ জন উপস্থিত হয়।

- পিটার আহমদ, সেঃ তা'লীম ও তরবিয়ত

শোক সংবাদ

অত্যন্ত গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, আমাদের প্রিয় ভ্রাতা নও মোবাইন জনাব মোস্তাফিজুর রহমান সাহেবের এক মাত্র কন্যা ২২/০৩/২০০৩ বিকালে পানিতে ডুবে মারা যায় (ইন্না লিল্লাহে ... রাজেউন)। মেয়ের মৃত্যুতে মা এখন পাগল প্রায়। মোস্তাফিজুর রহমান তাঁর স্ত্রীর সুস্থতার জন্য এবং কন্যার রূহের মাগফিরাতের জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করেছেন। মৃত্যুকালে মেয়ের বয়স ছিল ১৬ মাস।

- মোহাম্মদ আবুল খায়ের
মোয়াল্লেম

শুভ বিবাহ

♦ জনাব মোঃ বজলুর রহমান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ তাহমিনা রহমান (নিপা), সাং- সুত্রাপুর, ঈদগা লেন, বগুড়া-এর বিয়ে জনাব মোঃ রহিস মিয়া-এর পুত্র জনাব কামাল আহমদ, গ্রাম ও ডাকঘর- তারুয়া, জিলা- বি.বাড়ীয়া-এর সাথে ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৬/০২/০৩ তারিখ রোজ বুধবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় জলসা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, মুরব্বী, সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৩৩/০৩ তারিখ ০৬/০২/০৩।

♦ জনাব মোঃ হামজা আমীর আলী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ জিনাতুল ফেরদৌস, সাং- তে-বাড়ীয়া, ডাকঘর ও জিলা- নাটোর-এর বিয়ে জনাব মোঃ আব্দুল হাদী ভূঁইয়া-এর পুত্র জনাব মোঃ নাজির হোসেন ভুইয়া সাং- ক্রোড়া, ডাকঘর- ক্রোড়া, থানা- আখাউড়া, জিলা-বি.বাড়ীয়া-এর সাথে ৭০,০০০/= (সত্তর হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৬/০২/০৩ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় জলসা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব মাওলানা আবদুল আজিজ সাদেক, মুরুব্বী, সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৩৪/০৩ তারিখ ০৭/০২/০৩।

♦ জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ সৈয়দা মেরিয়া মারুফা (শিমুল), সাং- তেরগাতি, ডাকঘর- মুমুরদিয়া, জিলা-কিশোরগঞ্জ-এর বিয়ে মরহুম নুরুল ইসলাম মল্লিক-এর পুত্র জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান মল্লিক সাং- ১২৫/৫, পশ্চিম দেওভোগ, জিলা-নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৭/০২/০৩ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় জলসা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, মুরব্বী, সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৩৫/০৩ তারিখ ০৭/০২/০৩।

♦ জনাব মোঃ আতাউর রহমান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ মোবাশ্বেরা খাতুন (আঁখি), সাং- নাসেরাবাদ, জিলা- কুষ্টিয়া-এর বিয়ে জনাব মোঃ শামসুল আলম-এর পুত্র জনাব মোঃ হাবিবুল আলম সাং- কটিয়াদী, জিলা-কিশোরগঞ্জ-এর সাথে ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৭/০২/০৩ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় জলসা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, মুরব্বী, সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৩৬/০৩ তারিখ ০৭/০২/০৩।

♦ জনাব বশীর আহমদ হাজারী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ ঝুমি হাজারীকা, সাং ও ডাকঘর-ঘাটুরা, জিলা- বি.বাড়ীয়া-এর বিয়ে জনাব সৈয়দ আবদুল হান্নান-এর পুত্র জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা সাং- ৪৭৫/(৫)হ, দক্ষিণ পাইকপাড়া, মীরপুর, ঢাকা-এর সাথে ২,০০,০০১/= (দুই লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৯/০২/০৩ তারিখ রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান,নির্বাহী সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৩৭/০৩ তারিখ ২৮/০২/০৩।

♦ মরহুম আহসান উল্লা শিকদার-এর কন্যা মোসাম্মাৎ সারওয়াদ আহসান শিকদার, সাং ১-ই-৬, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬-এর বিয়ে জনাব আব্দুল মতিন-এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ তানভীর হাসান সাং- ১৬৮, পূর্ব রাজা বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৬-এর সাথে ১,০০,০০১/= (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৬/০২/০৩ তারিখ রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার দারুত তবলীগ মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৩৮/০৩ তারিখ ২৮/০২/০৩।

♦ জনাব ডাঃ মোঃ আব্দুল গফুর-এর কন্যা মোসাম্মাৎ আকলিমা বেগম ডেইজী, সাং - তারুয়া, ডাকঘর- তারুয়া, জিলা- বি. বাড়ীয়া-এর বিয়ে জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী-এর পুত্র জনাব সৈয়দ তোফাজ্জল আহমদ সাং- তেরগাতি, ডাকঘর-মুমুরদিয়া, জেলা-কিশোরগঞ্জ-এর সাথে ৫০,০০১/= (পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৮/০২/০৩ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, দুর্গারামপুর জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, মুরব্বী সিলসিলাহ্।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৩৯/০৩ তারিখ ০৭/০৩/০৩।

♦ জনাব শহীদ আহমদ-এর কন্যা মোসাম্মাৎ রাহাতুল ফেরদৌস (পুতুল), সাং - আহমদ নগর, ডাকঘর-ধাক্কামারা, জিলা-পঞ্চগড়-এর বিয়ে জনাব মতিউর রহমান-এর পুত্র জনাব শহীদ আহমদ (এনাম) সাং-সুলতানপুর, ডাকঘর- চরসিন্দুর, জেলা-নরসিংদী-এর সাথে ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৮/০২/০৩ তারিখ রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, আহমদনগর জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন জনাব শরীফ আহমদ, প্রেসিডেন্ট, আহমদনগর আহমদীয়া মুসলিম জামাত।

ন্যাশনাল রিশ্‌তানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন সুসম্পন্ন হয়েছে, যার রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৪০/০৩ তারিখ ১৯/০৩/০৩।

এসব বিয়ে সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্‌তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগরের ২১তম সালানা জলসা ২০০৩ সফলভাবে অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্‌তাআলার অশেষ ফযল ও রহমতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত আহমদনগর-এর ২১তম সালানা জলসা ২০০৩ গত ১১ ও ১২ই এপ্রিল ২০০৩ শুক্র ও শনিবার অত্যন্ত সফলভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্‌। এ জলসায় ৩টি অধিবেশন ছাড়াও একটি প্রশ্নোত্তর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র থেকে ন্যাশনাল আমীর মোহতরম জনাব মোবাশ্‌শের উর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এ মহতি জলসায় উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ হলেন সর্বজনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ ও সেক্রেটারী তবলীগ, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্‌, জেনারেল সেক্রেটারী, একে রেজাউল করীম, সেক্রেটারী উমুরে আমা, আব্দুস সাত্তার, সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা, নূরুল হক, সেক্রেটারী অডিও-ভিডিও ও তাঁর দল এবং সদর মুরব্বী মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব সহ আরো কতিপয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত জলসায় রাজশাহী বিভাগের প্রায় প্রতিটি জামাত ছাড়াও ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চরসিন্দুর, নোয়াখালী, উথলী, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনার অসংখ্য জলসানুরাগী নর-নারী উপস্থিত হয়েছিলেন।

উদ্বোধনী অধিবেশন

১১ এপ্রিল ২০০৩ শুক্রবার বেলা ৩টায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অধিবেশনের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের পূর্বে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌, এবং উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব তৌফিক আহমদ। এরপর শুরু হয় বক্তৃতা পর্ব। কবুলিয়তে দোয়া, মহানবী (সঃ)-এর জীবনাদর্শ ও ওফাতে ঈসা, এ তিনটি বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে সর্বজনাব মাওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌, শরীফ আহমদ, প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর ও মৌলবী কামরুল ইসলাম প্রধান, মোয়াল্লেম। বক্তৃতা পর্বের মাঝে বাংলা নযম পরিবেশন করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান। মাগরেবের নামাযের পূর্বে উদ্বোধনী অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

সন্ধ্যার পর শুরু হয় বিশেষ প্রশ্নোত্তর ও তবলীগের একটি প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান। এতে উপস্থিত প্রশ্নকারীগণের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেব, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ ও জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২

দ্বিতীয় অধিবেশন

১২ এপ্রিল ২০০৩ শনিবার সকাল ৯.৩০ মিঃ অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ সাহেব। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মৌলবী মাহমুদ আহমদ শরীফ, মোয়াল্লেম এবং উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব এহসানুল হাবীব জয়। এরপর শুরু হয় বক্তৃতা পর্ব। ওয়াকফে নও ও তরবিয়তে আওলাদ, এতায়াতে নেযাম ও ইসলামে নারীর মর্যাদা বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ্‌, ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী এবং মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা। এরপর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল আমীর, মোহতারম মোবাশ্‌শের উর রহমান সাহেব। মোহতরম আমীর সাহেবের বক্তৃতার পর দ্বিতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

সমাপ্তি অধিবেশন

সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় জলসার দ্বিতীয় দিন শনিবার বেলা ৩টায়। এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মোবাশ্‌শের উর রহমান সাহেব। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ইস্রাইল দেওয়ান, অবসরপ্রাপ্ত মোয়াল্লেম এবং জনাব ইব্রায়েতুল হাসান হিন্দি নযম পাঠ করেন। এরপর শুরু হয় বক্তৃতা পর্ব।

খাতামান্নাবীঈন (সঃ) এবং হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতা ও আহমদীয়া মুসলিম জামাত, এ বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মাওলানা সালেহ্‌ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ ও জনাব এ. কে, রেজাউল করীম, ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমুরে আমা। বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব তৌফিক আহমদ। দায়ী ইলাল্লাহ্‌ বিষয়ে প্রাণবন্ত বক্তব্য রাখেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেব।

জলসায় আগত মেহমানগণের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং দোয়ার এলান করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব শরীফ আহমদ সাহেব। আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর, মোহতরম মোবাশ্‌শের উর রহমান সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, আহমদনগর এর ২১তম সালানা জলসা অত্যন্ত সফলতার সাথে নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি ঘটে, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌।

- আহমদী বার্তা

মসীহে মাওউদ (আঃ) দিবস পালন

পরবর্তীতে যেসব জামাত ও সংগঠন থেকে মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) দিবস পালনের সংবাদ পাওয়া গেছে তারা হলেন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিষ্ণপুর, শৈলমারী, চরসিন্দুর, তারুয়া, খাকদন, চানপুর চা বাগান, চট্টগ্রাম, রংপুর, খুলনা, কুকুয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, ইসলামগঞ্জ, বকশীগঞ্জ, ক্রোড়া, সরিষাবাড়ী ও কাফুরিয়া এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া নুসরতাবাদ ও লাজনা ইমাইল্লাহ্‌, রংপুর ও চট্টগ্রাম।

- আহমদী বার্তা

তেরগাতী জামাতের তৃতীয় জলসা সালানা সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত তেরগাতী ২৮শে মার্চ, ২০০৩ইং শুক্রবার সাফল্যের সাথে ৩য় জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম অধিবেশন সকাল ৯টায় কটিয়াদী জামাতের প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে আরম্ভ হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌঃ আবুল কাশেম আনসারী, মোয়াল্লেম, নযম পেশ করেন জনাব খলিল আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন ন্যাশনাল আমীর-এর প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২। তরবিয়তে আওলাদ ও চরিত্রগঠনে আহমদী যুবকের দায়িত্ব, সিরাতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন যথাক্রমে কেন্দ্রীয় মেহমান, জনাব হাবিবুল্লাহ্, এ কে রেজাউল করীম। ওফাতে ঈসা (আঃ) উপর বক্তৃতা করেন হাফেয সেকান্দর আলী।

দ্বিতীয় অধিবেশন বিকাল ৩টায় ন্যাশনাল আমীর-এর প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয সেকান্দর আলী, মোয়াল্লেম। উর্দূ নযম পেশ করেন এহসানুল হাবীব জয়। খেলাফতের গুরুত্ব সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সৈয়্যদ আনোয়ার আলী। হযরত রসূল (সঃ) ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর আগমন সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মাওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। শুকরিয়া জ্ঞাপন ও দোয়ার এলান করেন সৈয়্যদ আনোয়ার আলী। সমাপনি ভাষণ ও দোয়া জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২, এর মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। জলসায় বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে সুললিত কণ্ঠে বাংলা নযম পেশ করেন জনাব ইব্রায়েতুল হাসান এবং সাখাওয়াত হোসেন।

কটিয়াদী, বীরপাইকশা, তারুয়া, দুর্গারামপুর হতে জলসায় যারা যোগদান করেন তাদের উপস্থিতি সংখ্যা লাজনা নাসেরাতসহ ৩০০ জনেরও অধিক।

- মোঃ নজরুল ইসলাম
চেয়ারম্যান , জলসা কমিটি
আহমদীয়া মুসলিম জামাত
তেরগাতী

ওয়াকফে নও সন্তান এবং পিতামাতার তা'লীম-তরবিয়তি ক্লাস

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ গত ১৮/০৩/২০০৩ইং তারিখ হতে ১৯/০৩/০৩ইং তারিখ পর্যন্ত ১২ দিন ব্যাপী ওয়াকফে নও সন্তান এবং তাদের পিতামাতাদের তা'লীম - তরবিয়তি ক্লাসের ব্যবস্থা করেন। উক্ত ক্লাসে ফতুল্লা জামাতের ওয়াকফে নওরাও যোগদান করে। ৩০/০৩/০৩ইং তারিখ বিকাল ৩.০০ মিনিট হইতে ৩১/০৩/০৩ইং তারিখ পর্যন্ত ওয়াকফে নও সন্তান ও পিতামাতাদের তালিমী পরীক্ষা / প্রতিযোগিতা ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ক্লাস পরিচালনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব দেওয়ান মোঃ নিজাম উদ্দীন ও সহযোগীবৃন্দ। উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন খাকসার মোঃ মোস্তাফা পাটওয়ারী, সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি যথাসময়ে উপস্থিত হতে না পারায় উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন মোহতারম হেলাল উদ্দীন আহমদ, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, নারায়ণগঞ্জ। উদ্বোধনী অধিবেশনে কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে সিকদার সানি আহমদ এবং আহমদ জাকির হোসেন, ওয়াকফে নও সন্তান। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশন সম্পন্ন হয়।

অতঃপর সকাল ১০.০০ মিঃ হতে বিকাল ১.০০ মিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা যেমন- কুরআন, নামায, নযম, বক্তৃতা, দীনিমালুমাত বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়। পরীক্ষক হিসাবে ছিলেন দেওয়ান মোঃ নিজাম উদ্দীন, দরবেশ ওসমান আলী, আলহাজ্জ আলী আহমদ, জনাব আহমদ আলী, চৌধুরী আতিকুল ইসলাম এবং খাকসার।

উক্ত সম্মেলনে ওয়াকফে নও সন্তান ১৫ জন, মাতা ১১ জন, পিতা ১১ জন।

বিকাল ৩.০০ মিঃ হতে সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত সমাপ্তি অধিবেশন চলতে থাকে। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতারম মোঃ সাদেক দুর্গারামপুরী, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও। তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠ করেন ১ম স্থান অধিকারী ওয়াকফে নও সন্তান যথাক্রমে ওমর আহমদ আদর ও আহমদ জাকির হোসেন। তরবিয়তে আওলাদ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন খাকসার। সভাপতি সাহেবের ভাষণ, আহবায়ক সাহেবের ভাষণ, বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ ও দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি করা হয়।

- মোঃ মোস্তফা পাটওয়ারী
সেক্রেটারী ওয়াকফে নও

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP
Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৮৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 65 ◆19th Issue

April 15, 2003 ◆Tk. 10.00

Fortnightly

The AHMADI

রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لا إله إلا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি **MTA**-র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন রাত ৮টায় বাংলা সম্প্রচার
- প্রতি শুক্রবার জুমুআর খুতবার কিছুক্ষণ পর হুযূর (আইঃ)-এর সাথে বাংলা ভাষাভাষীদের মুলাকাত অনুষ্ঠান এবং প্রতি মঙ্গলবার সকালে পুনঃপ্রচার।

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ. - 3660

S.R - 27500

POL - VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 880-2-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com